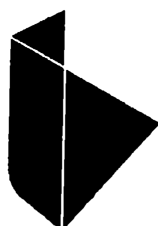

অচরাচর ২
মাশুদুল হক

অসচরাচর ২

অসচরাচর

২

মাশুদুল হক



চিরকুট

অসচরাচরঃ ২
মাশুদুল হক

১ম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা, ২০২৫

বইঘর.নেট
প্রকাশক
এ. কে. এম. মাফিউল কাদির আদন
চিরকুট প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অঙ্কন
শামীম আহমেদ

অঙ্গসজ্জা
চিরকুট প্রকাশনী

মূল্যঃ ২০০ টাকা মাত্র

Osochorachor: 2
by Mashudul Haque
Published by Chirkut Prokashoni
Price TK: 200.00 Only

উৎসর্গ

প্রিয় ফিরোজ হায়াত খান ও সারোয়ার হোসেন
এবং
এইট ডেজ এ উইক ক্যাফে'কে

যাদের সাথে এবং যেখানে,
আমার বেশিরভাগ সময় কেটেছে বইটা লেখার সময়।

Silas Lamb: Cure them? To What purpose?
Edward Newgate: Well to... bring them back to their senses.
Silas Lamb: And make a miserable man out of a perfectly happy horse?

(Stonehearst Asylum)

প্রারম্ভ

মেডিকেলের ফিফথ ইয়ারে পড়ার সময় আমার মাথায় কিছু সমস্যা ধরে পড়ে। প্রথম দিকে ব্যাপারটা এত মাইনর ছিল যে কেউ বুঝতেই পারেনি। সেই সময় আমাদের ওয়ার্ডের ক্লাস নিত মেডিসিনের জাঁদরেল প্রফেসর ইকবাল স্যার। ইকবাল স্যার বছর দুয়েক হয় মারা গেছেন, এত মেধাবী একজন মানুষ মারা গেল সেটা দেশের মানুষ টেরই পেল না। টের পেয়েছে স্যারের নিয়মিত রোগীরা, তারা এমন ডাক্তার আর পাবে কই!

ইকবাল স্যার গল্পে শোনা ডাক্তারদের মতো, যারা দূর থেকেই বলে দিতে পারেন রোগীর কী সমস্যা। স্যারের ক্লাসে এসব কিছু শিখেছিলাম, রোগীর বসা-হাঁটা ইত্যাদি দেখে বলে দেয়া তার সম্ভাব্য কী রোগ। অজ্ঞান রোগীর শোয়ার ধরন দেখেই বলে দেয়া ব্রেনের কোনো অংশে সমস্যা হয়েছে ইত্যাদি। ইকবাল স্যারই আমার সমস্যাটা ধরতে পারেন প্রথমে, অথচ আমি তখন সাইকায়াট্রি ওয়ার্ডে রেগুলার ক্লাস করি–সেখানকার কেউ সন্দেহও করেনি।

স্যার আমাকে ক্লাস শেষে রুমে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আসিফ, আমার ধারণা তোমার কোনো সাইকোলজিক্যাল সমস্যা আছে।' তারপর তিনি কিছু প্রশ্ন করেন, মূলত আমার দৈনন্দিন রুটিন জানতে চান এবং খুঁটিনাটি আরো কিছু ব্যাপার।

সেসব থেকে স্যার ডায়াগনোসিস করেছিলেন আমার সিজোফ্রেনিয়া থাকতে পারে। ইকবাল স্যারের কথা আমি প্রথমে খুব একটা আমলে নেইনি। বরঞ্চ বেশ রাগ হয়েছিল আগ বাড়িয়ে আমার ডায়াগনসিস করার জন্য। তবে তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলেই সেটা করেছেন তা নিয়ে নিশ্চিত আমি, স্টুডেন্ট হিসেবে আমি বরাবরই খুব ভালো থাকায় অনেক বড়ো বড়ো স্যারের বিশেষ স্নেহ পেয়েছি।

স্যারের সন্দেহ ক্রমশ সত্যি হয় পরে। ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষার আগ দিয়ে আমার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন সারারাত হোস্টেলের বারান্দায় পায়চারি করতাম আর কাল্পনিক নানা কিছুর সাথে কথা বলতাম। আমার বাপ-মা পরে আমাকে বাসায় নিয়ে যান। একটা হসপিটালে ভর্তি থাকি অনেকদিন।

একটা সময় আমি সুস্থ হই, সময়ের বা ঔষধের গুণে। পড়াশোনা শুরু করি আবার। পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি, পড়াশোনার ব্যাপারটায় খুব একটা ঝামেলা হয়নি, খুব সহজেই পাশ করে যাই পরীক্ষায় বসে। কিন্তু বুঝতে পারি আমি খুব একা হয়ে গেছি। ক্লাসমেটদের সাথে দূরত্ব বেড়ে গেছে, কেউ খোঁজ রাখতো না। আর সবাই তো নিজ নিজ ক্যারিয়ারে ব্যস্ত। পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে আর ইচ্ছা হলো না। মনে মনে পরিকল্পনা করলাম, দুই তিন বছর রোগী দেখবো, তারপর না হয় ইচ্ছা হলে আবার পড়াশোনা করবো।

ইকবাল স্যার বলতেন অ্যাটিপিক্যাল কেস পেলে সেই কেসের বিবরণ প্রত্যেক ডাক্তারের লিখে রাখা উচিত, পারলে পাবলিশ করা উচিত জার্নালে। এটা একজন ভালো ডাক্তারের বৈশিষ্ট্য। কারণ মানুষের রোগ-ব্যধি খুব রহস্যময়, তারা সবসময় একই ভাবে বইয়ের মতো করে আসবে না। অন্য রকম কেসগুলো যদি ডাক্তাররা সবাই রিপোর্ট করতো তাহলে রোগ-ব্যাধি বুঝতে, সেটার চিকিৎসা দিতে সুবিধা হয়, এভাবেই চিকিৎসা বিজ্ঞান তৈরি হয়েছে।

আমি তাই এই অভ্যাসটা করার চেষ্টা করছি। একটু অন্যরকম রোগী পেলেই আমি আমার একটা ডায়েরিতে সেটার বিস্তারিত লিখে রাখি। সেখান থেকেই আজকে আপনাদের কয়েকজন রোগীর গল্প শোনাবো। তবে বলে নেয়া ভালো, এসব রোগীদের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখতে অনেক ক্ষেত্রেই আমি নাম-ঠিকানা কিছুটা পরিবর্তন করে দিয়েছি। আরেকটা কথা হলো, কেসগুলো একান্তই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরীখে ব্যাখ্যা করেছি, চিকিৎসা দিয়েছি কখনো নন-ট্রেডিশনাল মেথডে–যেটা কারো কাছে আন-এথিক্যাল লাগতে পারে, কখনো এমন কাজও করতে হয়েছে যেগুলো এখন মনে পড়লে বুঝতে পারি অনুচিত কাজ হয়েছে। সেসবের জন্য আগেই পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সর্বশেষ কথা হলো, আমি এসব রোগী সম্পর্কে বা তাদের রোগ নিয়ে যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছি সেসব পুরোপুরি সঠিক সে দাবি আমি করছি না, মেডিকেল সায়েন্স ক্রমাগত উন্নত হওয়া একটা শাস্ত্র–তাই এসব কেসকে রেফারেন্স মেনে কেউ একই ধরনের কেসগুলোকে একই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন না, এই অনুরোধ থাকবে। সর্বশেষে আমার বন্ধু মাশুদুল হককে ধন্যবাদ, ও আমার কেসগুলো ডায়েরি থেকে নিয়ে পড়তে সুবিধে হয় এমন ভাষায় লিখে দিয়েছে, প্রকাশক জোগাড় করে দিয়েছে। যদিও ও আমাকে অনেকবার বলেছে কাজটা ও আনন্দ নিয়ে করছে, তারপরও আমি ওর কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ।

ডা. আসিফ আহমেদ

গল্পক্রম

পিচ্ছিল



বইঘর/মহাকাল

১.

আমার জীবনে আমি অনেক অস্বস্তিকর ব্যাপার দেখেছি। সেটার কারণ হয়তো এই যে আমার পেশাটাই এমন, কিংবা আমার অদৃষ্টে এসবই লেখা রয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমি কিছু অস্বস্তিকর ব্যাপারকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। কিছুটা হরর ফিল্মের চরিত্রের মতো, যে বুঝতে পারে সামনে কোনো ঝামেলা রয়েছে তাও পিছু হটবে না। একটা সময় যখন এসব সিনেমা দেখতাম তখন ওই চরিত্রগুলোর বিপজ্জনক আগ্রহকে তিরস্কার করতাম কিংবা বলা চলে যারা এসব উদ্ভট গল্প ফাঁদে তাদের বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলতাম। কিন্তু বাস্তবতা যে কিছুটা এমনই সেটা অনেক পরে বুঝেছি।

ভূমিকা বাদ দিয়ে মূল ঘটনায় আসা যাক।

এটা প্রায় দুই বছর আগের ঘটনা। তখন আমি সৈয়দপুর থাকি। খুব মনোরম ছিমছাম একটা শহর। ওখানে রেলের কর্মচারীদের জন্য যে হাসপাতাল সেখানে ডিউটি করি। বেশ আরামের চাকরি, রেলের সাথে জড়িত লোকজনকেই মূলত দেখতে হয় বলে রোগী বেশ কম।

সৈয়দপুর ব্যস্ত শহর হলেও রেল হাসপাতালটি খুব নিরিবিলি জায়গা। লাল ইটের ব্রিটিশ পিরিয়ডের স্থাপনা, বড়ো বড়ো সব কক্ষ নিয়ে একেকটি হাসপাতাল-ওয়ার্ড, উঁচু দরজা জানালা। যখন ডিউটি করি মনে হয় একশ বছর সময় পিছিয়ে কোনো দপ্তরে হাজির হয়েছি। চারদিকে নান্দনিক গাছপালাসহ বিশাল জায়গা জুড়ে হাসপাতাল, রেলের জায়গা বলে ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপেও এটি সংকুচিত হয়নি। তবে রোগীর সংখ্যা কম বলে অনেকগুলো কামরা পরিত্যক্তের মতো। ইনডোরের জন্য বরাদ্দ কেবিনে মাসে দশ-বারোটি রোগী থাকে। আউটডোরে দুপুরের দিকে কিছুটা ব্যস্ততা থাকে, বিনামূল্যের ঔষধ এর একটা মূল কারণ।

আমি থাকি হাসপাতালেরই কাছেই এক অফিসার্স কোয়ার্টারে। ওখানেও মানুষজন বেশ কম। আমার সাথে অন্য যে কয়েকজন মেডিকেল অফিসার রয়েছেন তারা কেউই এখানে স্থায়ী না। তাই সন্ধ্যার পর আমার সময় কাটে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়, বই পড়ে বা কখনো সিনেমা দেখে। মাঝে মধ্যে মনে হয় আমি জনমানবহীন কোনো দ্বীপে রয়েছি। রেলের ক্যান্টিন থেকে দু'বেলা খাবার আসে। খাবার খুব বেশি ভালো না, আবার তেমন আপত্তিরও সুযোগ নেই, আমার মতো মানুষের জন্য যথেষ্ট।

এরমধ্যে একবার এক হেলথ-ক্যাম্পেইনে নীলফামারী জেলা কারাগারে যেতে হয়। জায়গাটা সৈয়দপুর থেকে দশবারো কিলোমিটার দূরে, রেলের সাথে কারাগারের কী সম্পর্ক থাকতে পারে জানি না, তবে কারাগারের কোনো মেডিকেল সাপোর্ট লাগলে ওরা অনেক আগে থেকেই রেল-হাসপাতালে যোগাযোগ করতো। এ সম্পর্কটা সম্ভবত শুরু হয়েছে সৈয়দপুর হাসপাতাল থেকে সাহায্য চেয়েও না পাওয়ার হেতু। সৈয়দপুর হাসপাতাল পুরো জেলার সবচেয়ে ব্যস্ত হাসপাতাল, ওরা তাই কোনোভাবেই বাড়তি সহায়তা দিতে পারে না।

কারাগারের নিজস্ব স্থায়ী ডাক্তার না থাকায় কয়েকমাস পরপরই এই ক্যাম্পেইনের মতো ব্যাপারটা ঘটতো। তো এবার যখন গেলাম, তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম শফিক ওখানে ডেপুটি জেলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। শফিক আমার স্কুল জীবনের বন্ধু, নতুন বদলি হয়ে এখানে এসেছে। আমি ওকে চিনতে পারিনি প্রথমে। শরীরে মনে হলো বয়সের ছাপ পড়েছে, মেদ জমেছে, চুল কমেছে। দেখে মনে হচ্ছে বয়স চল্লিশ পার। ওই আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম না, ক্লাসমেট বলা চলে। তবে এটাও ঠিক আমাদের মধ্যে কোনো ঝামেলাও ছিল না। সেই সূত্রে যোগাযোগটা ছিল প্রয়োজনের, তাই যখন শুনলাম ও নিজেও সৈয়দপুর থাকে তখন ভালোলাগা কাজ করলো। অন্তত এই অচেনা শহরে পরিচিত একজনকে মিলল।

জেলে রোগী তেমন ছিল না। যারা ছিলেন তাদের ছোটোখাটো সমস্যা, কারো পেটে গোলমাল, কারো প্রেশারের ঔষধ যাচাই করে দেখা, চামড়ার রোগ ইত্যাদি। তাই ক্যাম্পেইন শেষে শফিকের সাথে কিছুসময় আড্ডা দেয়ার অবসর পাওয়া গেল।

তুই সিলেটে গিয়ে তো আমাদের ভুলে গেছিস!

আমি হাসি। সিলেটে কত কিছু ঘটে গেছে তা যদি ও জানতো।

আমি বললাম, তুই তো কেমিস্ট্রিতে পড়াশোনা করলি। পরে জেলার কেন?

ও হেসে বলল, এই দেশে কয়জন নিজের সাবজেক্টে চাকরি করে বল। তোদের মতো ভাগ্যবান তো সবাই না?

হুম, সেটা সত্যি। তবে অনেক ডাক্তারও এখন ডাক্তারি করছে না, তারা নানা ধরনের রিসার্চ টাইপ কাজ করছে।

তারপরও সেটাও সাবজেক্ট রিলেটেড।

হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের পুরো সময়তো ছিল রোগী দেখা নিয়ে ফোকাসড। তাই কিছুটা সাবজেক্ট থেকে সরে আসাই।

রেলের চাকরি কেমন লাগছে?

খুব বেশি ভালো না। মনে হয় না বেশিদিন করতে পারবো।

বলিস কি! ওখানে শুনেছি কাজের প্রেশার বেশ কম।

হ্যাঁ, সেটা সত্যি এবং এটাই মূল কারণ। ওখানে গত মাস কাজ করে মনে হচ্ছে আমি অনেক কিছু ভুলতে বসেছি।

বাহ, তার মানে আজকের মতো ক্যাম্পেইন আরো করলেও কোনো আপত্তি নেই?

আমি হেসে ফেললাম, অবশ্যই না। যদিও এখানে আসলে প্রকৃত অর্থে তেমন কোনো রোগী নেই।

তা সত্যি। বেশি অসুস্থ হলে তো আমরা সদর হাসপাতাল কী রংপুরে পাঠিয়ে দেই।

তবে একজন রোগীকে একটু খারাপ মনে হলো, মানে আমি একজনকে টেস্ট দিয়েছি চেক করিস। মনে হলো বেশ অ্যানেমিক। হাতে পায়ে কোনো স্কিন ডিজিসও আছে, গুটি গুটি উঠেছে।

ও হ্যাঁ, আমি হিসাব রেখেছি। ওকে রংপুরে পাঠাব এমন প্ল্যান আছে। বেশ শক্তসমর্থ একটা ছেলে, হঠাৎ করে অসুস্থ হয়েছে। ওর নাম কুদ্দুস। তবে ছেলেটা কিন্তু ডেঞ্জারাস, ছোটো একটা ছুরি দিয়ে এক লোকের পেট ফাঁসিয়ে খুন করার চেষ্টা করেছিল, ভাগ্য ভালো শেষ পর্যন্ত ভিকটিম মরেনি। নাহলে মার্ডার কেসের আসামি হয়ে যেত।

আমি শুনে অবাকই হলাম। ছেলেটাকে দেখে মনে হয় না এমন কিছু করা ওর পক্ষে সম্ভব, বেশ নিষ্পাপ অসহায় চেহারা। তবে সব আসামিরই ষণ্ডামার্কা মুখ থাকবে সেটা আশা করা ঠিক নয় নিশ্চয়ই।

শফিকের সাথে সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া করলাম, কোনোমতেই না খেয়ে চলে আসতে দিল না। আর সৈয়দপুরে নিয়মিত দেখা করবো এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হলো।

২.

শফিকের সাথে এরপর অনিয়মিত ভাবে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। মাঝখানে ফোনে এক-দুইবার ওর জেলের কয়েকজন রোগীর ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল। আরেকদিন ওর ছোটো ছেলের একটা সমস্যার কারণে কোনো

হাসপাতালে চিকিৎসা ভালো হবে এ ধরনের একটা আলাপ করতে ও আমার চেম্বারে এসেছিল। শুনলাম সৈয়দপুরে ও এখন একলাই থাকে। ওর স্ত্রীর সাথে ওর সম্পর্ক ভালো না। ছেলেকে নিয়ে ভদ্রমহিলা আলাদা থাকেন চট্টগ্রামে।

হেলথ ক্যাম্পের আনুমানিক মাস তিনেক পর একদিন শফিক আবার রেল-হাসপাতালে এসে হাজির। আমি চায়ের কথা বলে আমার রুমে বসালাম।

ও পকেট থেকে একটা কৌটার মতো বের করে আমার টেবিলে রাখলো।

আমি সপ্রশ্নক হয়ে তাকাতে বলল, দেখতো এটা কীসের ঔষধ?

আমি লেবেল এ নামটা দেখে চিনলাম না। বললাম, আয়ুর্বেদিক কিছু হতে পারে, এই নামের ঔষধ তো চিনতে পারলাম না।

শফিক হতাশ হয়ে বলল, আমিও বইপত্র ইন্টারনেট ইত্যাদি ঘেঁটে দেখেছি, নাই। মনে হচ্ছে অন্য কোনো দেশের ঔষধ।

আমি তাতে সায় দিলাম। কারণ লেবেলের লেখাটাও অপরিচিত লাগছে, থাই বর্ণমালার মতো মনে হচ্ছে।

কার ঔষধ?

শফিক একটু ইতস্তত করে বলল, তোর মনে আছে কুদ্দুস নামে একটা ছেলে আসামি ছিল? লাস্ট ক্যাম্পেইনে তুই বলছিলি ছেলেটাকে কিছুটা অসুস্থ মনে হয়েছে।

হ্যাঁ, ল্যাব টেস্ট দিয়েছিলাম কিছু। যতদূর মনে পড়ে হিমোগ্লোবিন সামান্য কম ছিল, ক্যালসিয়াম বেশি ছিল। খুব সম্ভবত ভিটামিন ট্যাবলেট টাইপ বেশি খেয়েছে। অন্যসব স্বাভাবিক। এটা ওরই ঔষধ?

হ্যাঁ, এই ঔষধ সম্ভবত ওকে আগের কোনো এক ডাক্তার দিয়েছিল।

কী জন্য দিয়েছিল কুদ্দুস জানে না?

উহুঁ, সেটা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি। মাস দুয়েক আগে ও জেল থেকে পালিয়েছে।

পালিয়েছে?

হ্যাঁ, একদম সিনেম্যাটিক কায়দায়। ওর সেলের মেঝেতে ও সুড়ঙ্গ করেছিলো। সেখান দিয়ে!

বলিস কি! বাস্তবেও এমন হচ্ছে?

এমন তো হয়ই। কিন্তু আমাদের চোখ এড়িয়ে গেল কীভাবে সেটা এক রহস্য।

কত লম্বা সুড়ঙ্গ?

পালিয়েছে যেহেতু তার মানে অন্তত বিশ ফিট তো হবেই। ওর সেলটা বাইরের দেয়ালের পাশেই। কিন্তু এত সরু আমরা বেশিদূর ঢুকে দেখতে পারিনি।

ইন্টারেস্টিং! কিন্তু ওর ঔষধ নিয়ে গবেষণা করছিস কেন? হতেই পারে কোনো নন অথেনটিক সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছিলো, আমাদের দেশে এমন কত ঔষধ আছে যেগুলো কই তৈরি হয় তার কোনো হদিশ নেই। আর তোর জেলে বাইরের কিছু আসে না সেটা নিশ্চয়ই সত্যি না।

হুম, অনেক কড়াকাড়ি সত্ত্বেও সিগারেট, গাঁজা ইত্যাদি আসলে ঢুকে পড়ে, আমাদের গার্ডদের মাধ্যমেই। এভাবেই নিশ্চয়ই এসেছে। আমার আগ্রহ দুটো কারণে, এক আমার ঔষধপত্র নিয়ে আইডিয়া ভালো, এটা চিনতে পারছিলাম না বলে জানার ইচ্ছে হচ্ছিলো। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয় কুদ্দুসের পালানের সাথে এই ঔষধের কোনো সম্পর্ক আছে।

মানে?

মানে হলো, গত দুইমাসে কুদ্দুস একাই পালায়নি। পালিয়েছে আরো একজন। ওর সেলেও একই মেডিসিনের কৌটা ছিল!

আমি শফিকের আশঙ্কায় মনে মনে না হেসে পারলাম না। জেল পালানোরও যে ঔষধ থাকতে পারে এবং এমন সন্দেহ কোনো লোক করতে পারে সেটা এক বিস্ময়।

তবে আমি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলাম, দ্বিতীয় কয়েদি কীভাবে পালালো? এও সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল?

সেটা আমরা জানি না। খুব সম্ভবত একই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করেছিল। কুদ্দুসের সেলে ও ঢুকেছিল সম্ভবত গার্ডদের হাত করে।

এমনকি হতে পারে, সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, সেটার জন্য এটা কোনো শক্তিবর্ধক সাপ্লিমেন্ট। এবং তারা হয়তো একই সাথে প্ল্যান করছিলো।

শফিক মনে হলো আমার কথায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলো না। কিংবা হতে পারে ওর মনে কিছু একটা আছে যেটা ও বলতে পারছে না।

ওকে ভরসা দেয়ার জন্য বললাম, তুই মেডিসিনটা রেখে যা। আমি আমার কোনো ডাক্তার বন্ধু, যারা নন ট্রেডিশনাল মেডিসিন নিয়ে জানে, তাদের থেকে যাচাই করে নেব।

সে কথায় ওর মুখ উজ্জ্বল হলো। বলল, হ্যাঁ, প্লিজ। এটা হলে ভালো হয়।

মেডিকেল প্র্যাকটিসের শুরু থেকেই এই ধরনের চাইনিজ বা বার্মিজ সাপ্লিমেন্ট দেখে দেখে এত বিরক্ত হয়েছি, এবং নানা কোম্পানির প্ররোচনায় আমাদের ডাক্তারদেরই অনেককে এ ধরনের ভিটামিন ট্যাবলেট গুঁড়ো করে বানানো ঔষধ রোগীদের দিতে এবং সে কারণে তাদের অন্যদের কাছে নীতিহীন ডাক্তার ট্যাগ পেতে দেখেছি যে শফিকের ওই মেডিসিন কৌটা নিয়ে কারো সাথে আলাপ করার কোনো উদ্দীপনা পাচ্ছিলাম না, বরঞ্চ তাতে হাসির পাত্র হওয়ার সম্ভাবনা ঢের। তাই কৌটাটা আমার ড্রয়ারেই পড়ে রইলো।

মাসখানেক পর আমি একটা কাজে ঢাকা গিয়েছি। গিয়েছিলাম মূলত একটা পরীক্ষা দেয়ার জন্য। নতুন করে আবার পড়াশোনা শুরু করছি। পোস্ট-গ্রাজুয়েশনের পরীক্ষাগুলো এতদিন দেইনি। পরীক্ষা শেষে পিজি হাসপাতালের রেসিডেন্ট নাইম এর সাথে দেখা হলো। নাইম এমডি কোর্সে আছে ইন্টারনাল মেডিসিনে।

আমি পরীক্ষা দিয়েছি শুনে খুব খুশি হলো। বলল, তোর যে হয়ে যাবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কন্টিনিউ করবি তো?

আমি হেসে বললাম, আগে হোক তো। জানিস, কত বছর পর বই খুলেছি।

তুই বই না খুললেও হবে।

আমাদের কথার মাঝখানে শফিক ফোন দিল। আমি কিছুটা বিরক্ত হলাম। আবার নিশ্চয়ই সেই ঔষধের প্রসঙ্গ টানবে। ওটা যে আমার ড্রয়ারে রাখা আছে সেটা তো বলা যায় না। তারচেয়ে ফোনটা না ধরি।

ফোনটা কেটে আগের কথার জবাবে বললাম, বেশি বলে ফেলছিস, শোন, তোকে একটা ছবি দেখাই, দেখতো ড্রাগটা চিনতে পারিস কিনা?

বলে আমি ফোন থেকে ঔষধটার ছবি বের করলাম। বুদ্ধি করে ছবিটা তুলেছিলাম।

নাইমও দেখে চিনতে পারলো না। বিস্তারিত বললাম ওকে। শুনে একচোট হাসলো।

দিয়েছে নিশ্চয়ই ইসমাইলের মতো কেউ!

ইসমাইলের আমাদের ব্যাচের ধান্ধাবাজ ডাক্তার। নানা ঔষধ কোম্পানি থেকে কমিশন নিয়ে প্রচুর পয়সা করেছে। ক'দিন পরপরই নানা সাপ্লিমেন্ট কোম্পানি থেকে নানা দেশে ট্যুর দিয়ে বেড়ায়। হাতের ঘড়ি থেকে পায়ের জুতো, প্রতিটাতেই ঔষধ কোম্পানির লোগো পাওয়া যায়। আমাদের সামনে পড়লে এটা নিয়ে খুব চটুল আলোচনা হয়, ইসমাইল তাতে রাগ করে না,

ওর যুক্তি হচ্ছে রোগীর পয়সা থাকলে তাকে কিছু ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিলে আর কী অন্যায় হয়।

আমি সাথে সাথে নাইমকে বললাম, এক কাজ করা যায়, ইসমাইলের কাছেই জিজ্ঞেস করি!

ইসমাইলের ফোন নাম্বার নাইমের কাছে ছিল। ওকে ঔষধের নাম বলাতে মনে হলো রাগ করলো। বললো, তোদের কাছে আমার ইমেজ এটাই! আমি যে কয়েকটা দেশ থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েশন করে এলাম, এত বড়ো বড়ো কোর্স করে এলাম, তোরা কী না এখনো আমাকে সাপ্লিমেন্ট বেচা ডাক্তার মনে করিস!

নাইম মুচকি হেসে বলল, সাপ্লিমেন্ট বিষয়ক তোর নলেজটা তো ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। রাগ করছিস কেন?

আচ্ছা, নামটা পাঠা।

নামটা শুনে ইসমাইলও চিনলো না। ওকে ছবি পাঠালাম। ছবি দেখে বলল, এটা অন্তত নিশ্চিত যে এটা প্রচলিত কোনো সাপ্লিমেন্ট না। কোম্পানিও পরিচিত না। দেখে মনে হচ্ছে ভিয়েতনামের ড্রাগ। এটা বেআইনি কিছু হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। এ ধরনের মোড়কে একসময়ে দেশে কোকেইন টাইপ ড্রাগ আসতো।

শফিককে সে কথা জানালাম। শফিক বললো ও ফোন দিয়েছিলো মূলত একই ধরনের আরেকটা ব্যাপার ঘটেছে। তৃতীয় আরেকজন কয়েদি পালিয়েছে। এখন ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি চলছে।

আমি বললাম, খুব সম্ভবত কয়েদিরা ওদের শারীরিক সহ্য ক্ষমতা বা টানা শ্রম করতে এই ড্রাগ ব্যবহার করছে। কোকেইন এর এই প্রপার্টি আছে। স্নায়ুকে ভীষণ উত্তেজিত করতে পারে। সুড়ঙ্গ খোড়ার ফাইনাল স্টেজে খুব সম্ভবত এটা সাহায্য করে।

৩.

সৈয়দপুর যেদিন ফিরলাম তার পরদিনই শফিক আবার আমার হাসপাতালে এসে হাজির। মনে হলো ও সিন্দবাদের ভূতের মতো আমার কাঁধে চেপে বসছে। খুব কষ্ট করে বিরক্তি চেপে ওকে বসাই।

তবে খানিকপরই আমার বিরক্তি কেটে যায়। ছেলেটা বিপদে পড়েছে। এবং একজন ভালো কর্মকর্তা হিসেবে ওর হাতের ক্লু থেকে রহস্য

উদঘাটনের চেষ্টা করছে। এটাকে সাধুবাদ জানানো উচিত। শুধু একটা ব্যাপার নিয়েই ও বাড়াবাড়ি করছে, ড্রাগটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছে। এর একটা কারণ হতে পারে ওর পড়াশোনা। কারা কর্মকর্তা হলেও ও রসায়নের ছাত্র সেটা এখানে কোনোভাবে প্রভাব ফেলছে।

চা দিতে বলি? আমি ওকে বসিয়ে বললাম।

না আসিফ, তোর কাছে এসেছি তোকে নিয়ে যেতে, তোর তো খানিকপর ডিউটি শেষ। আমার সাথে গাড়ি আছে।

আমি কপট বিস্ময় নিয়ে বললাম, অ্যারেস্ট করছিস নাকি?

ও চমকে হেসে ফেলল, হ্যাঁ দুই ঘণ্টার জন্য।

কী অপরাধে?

তোর বন্ধুর হেফাজত থেকে কয়েদিরা পালিয়ে যাচ্ছে, আর তুই তাকে ঠিকঠাক সাহায্য করতে পারছিস না।

হুম, ওকে চল। কিন্তু তোর কী মনে হয়, এর সাথে ওই ড্রাগের সম্পর্ক আছে?

সেটা জানি না। আমি আসলে তোকে আরো কিছু ব্যাপার দেখাতে চাই।

নতুন কিছু হয়েছে?

হ্যাঁ, চল দেখবি। দেখার পর বাকি আলোচনা।

আমি শফিকের সাথে বেরিয়ে পড়ি। শফিক কারাগারে পৌঁছে প্রথমে আমাকে এক কয়েদির সেলে নিয়ে গেল। এই অংশটায় আমি আগে আসিনি, একটা স্যাঁতসেঁতে বদ্ধ জায়গা। সামনে ঘন শিক দেয়া একটা দরজা। বারো ফিট বাই আট ফিট এর মতো একটা রুম, পেছনের দেয়ালে উঁচুতে খুব ছোটো একটামাত্র জানালা। এক দিকে একটা কমোড বসানো, হাঁটু মুড়ে বসার। বড়োজোর আড়াই-ফুট উঁচু একটা ছোটো দেয়াল দিয়ে সেটা আলাদা করা। রীতিমতো গা ঘিনঘিনে জায়গা। এখান থেকে কয়েদিরা পালাতে চাইবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

এখানে সুড়ঙ্গ কই?

শফিক যেন এই প্রশ্নটাই আশা করছিলো, এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। এই রুমে কোনো সুড়ঙ্গও নেই। কয়েদি কীভাবে পালিয়েছে সেটাও বুঝতে পারছি না।

এবার আমি ধাক্কা খেলাম। মানে?

মানে কয়েদি এই সেল থেকে কর্পূরের মতো উবে গেছে। আমরা সব দেয়াল পরীক্ষা করেছি। কোথাও কোনো ভাঙা নেই। সব ঠিকঠাক।

শফিক আমাকে দেয়ালগুলোর কাছে নিয়ে গেল। সবগুলো নিরেট। উপরে যে ছোটো জানালা আছে তাতে বড়োজোর কোনো বাচ্চা ছেলে শুধু মাথাটা বের করতে পারবে। বের হওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই।

মেঝেগুলো ভালো মতো চেক করেছিস? সুড়ঙ্গ খুঁড়লে ভিতর থেকে লাগিয়ে দেওয়ার মেকানিজমও থাকতে পারে।

উহুঁ, একসপ্তাহ ধরে প্রতি ইঞ্চি চেক করেছি। কয়েদি যেন ম্যাজিকের মতো হাওয়া হয়ে গেছে।

আমি থ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

এ তো রীতিমতো লকড রুম মিস্ট্রি। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে?

উহুঁ, এবং এটার রহস্য উন্মোচন না হওয়া মানে দোষটা পুরোপুরি আমাদের ঘাড়ে এসে পড়া।

রুমে কী কী ছিল?

যা দেওয়া ছিল সবই আছে। কয়েদি এক বস্ত্রে পালিয়েছে।

ওই মেডিসিনের কৌটাটা পেয়েছিস এর রুমেও?

হ্যাঁ, একই মেডিসিন। ভিতরে কোনো পিল নেই।

পরে আমরা শফিকের অফিস কক্ষে গিয়ে বসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই কয়েদির ব্যাপারে আরো ডিটেইলস বলতো?

শফিক আমার গোয়েন্দাগিরি কীভাবে নেবে সে আশঙ্কা ছিল না, কারণ ও চাইছেই আমি এটা নিয়ে মাথা ঘামাই। ওর অবশ্য আশা আমি মেডিসিনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করি, যেটা আমার মতে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার। হয়তো কয়েদিরা এই বিশেষ মাদকটি সহজে পাচ্ছে এখানে।

এই লোকটি ডাকাতি কেসের আসামি। খুব সম্ভবত খুন-খারাবিও করেছে। তবে সেসবের প্রমাণ নেই। বেশ গাঁট্টাগোট্টা লোক।

শফিক আমাকে ছবিও দেখায়। হ্যাঁ, একদম দাগি আসামি বললে আমাদের মনে যে ছবি ফুটে ওঠে তেমন চেহারা। চওড়া কপাল, ঘন ভ্রু আর গোঁফ, বড়োসড়ো নাক, মুখে বসন্তের দাগের মতো দাগ, হাত-পা পেশল। নাম জয়নাল। বয়স চল্লিশ।

আমি বললাম, মেডিসিনটা কোনোভাবে হাজতে ঢুকেছে। তোর গার্ডদের মাধ্যমেই। ওদেরও ভালো মতো চেক করা শুরু কর। আর সব রুমেই তল্লাশি চালা।

শফিক জানালো গত এক মাস ধরে ও প্রতিদিনই তাই করছে। নতুন করে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনে আমি বেশ হতাশ হলাম। তার মানে সাপ্লায়ার সতর্ক হয়ে গেছে।

জয়নালের আগের দুইজন তো সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে, জয়নালও একই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করেনি তার নিশ্চয়তা কী?

শফিক দৃঢ়ভাবে বলল, না না, সেটা সম্ভব না। ওটা তো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। পরদিনই সিমেন্ট ঢেলে ক্লোজ করে দিয়েছি।

হুম, জটিল সমস্যা। এবং মনে হচ্ছে বেশ অদ্ভুত এক রহস্যে পড়ে গেছি আমরা।

৪.

শফিকের সাথে এরপর আর আমার দীর্ঘদিন দেখা হয়নি। একটা কারণ হলো আমি রেলের চাকরি ছেড়ে ঢাকা চলে আসি। ইন্টারনাল মেডিসিনে এমডি কোর্সে চান্স হয়ে যায়, সেখানে ক্লাস-ডিউটি ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। যেমনটা আশঙ্কা করেছিলাম, এতদিন পর পড়াশোনা করে ভালো লাগবে না, সেরকম হলো না। মেডিসিন আমার প্রিয় বিষয় হওয়ায় আবারও বেশ উপভোগ করছিলাম। রেলের চাকরিটা যখন ছেড়ে দেই এমন সিদ্ধান্তে অনেকে অবাক হয়েছিল এবং কেউ কেউ নিরুৎসাহিত করেছিল। কিন্তু আমার জন্য রোগীহীন জীবন সহ্য করা কঠিন, মানুষের নানা ব্যাধির প্রতি আমার যে আকর্ষণ তাতে ওই মফস্বল শহরের ছোটো এক নিরিবিলি হাসপাতালে আরো কিছুদিন পরে থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। এমনকি লিয়েন বা শিক্ষা-ছুটির জন্যও দরখাস্ত করলাম না। ওই জীবনে আর ফেরত যেতে হয় সেটা আর চাচ্ছিলাম না।

শাহবাগে ছোটো একটা মেসে থাকা শুরু করলাম। সকালে নাস্তা করি রাস্তার পাশের এক টংয়ে, তারপর সারাদিন হাসপাতালে কাটাই, নাইট ডিউটি না থাকলে সন্ধ্যার দিকে লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়াশোনা করি। একটু সিনিয়র হওয়ায় কেউ এসে ঘাঁটাত না, নিজের মতো সময় কাটাই। লম্বা চুল দাড়ি রাখায় এমনিতেও কেউ চিনতো না। তবে হঠাৎ হঠাৎ কেউ আমাকে আবিষ্কার করে খুব অবাক হত। মোদ্দাকথা, আমি যে জীবন চেয়েছিলাম তেমন একটা জীবন যাপন শুরু করলাম।

তবে কয়েকমাস পর কিছুটা অর্থ-সংকটে পড়লাম। কোর্সের টাকায় চলে যায় কোনোমতে, তবে মাসে দুই-তিনটা বই কেনা, একটা সিনেমা দেখা বা ভালো রেস্তোরাঁয় এক দুইদিন খেতে চাইলে একটু টান পড়ে যায়। সে কারণে

মিরপুরের দিকে একটা চেম্বারে বসা শুরু করলাম। তাতে অল্প কিছু পয়সা আসা শুরু করলো।

মাস ছয়েকের মধ্যে চেম্বারটা বেশ জমে যায়। কোনো কোনো দিন রোগীর চাপে বেশ রাত করে রোগী দেখা শেষ করি। এগারটা-বারোটা বেজে যায়।

এমন একদিন বেশ রাত করে বের হতে যাব চেম্বার থেকে সেসময় শফিক আসলো।

শফিককে দেখে আমি চমকালাম। প্রথমত ও এসেছে একটা হুইল চেয়ারে। সাথে একটা ছেলে এসেছে যে পেছন থেকে ঠেলছে। ছেলেটা শফিককে চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে বাইরে বের হয়ে গেল।

আমি এত অবাক হলাম যে প্রথমে কোনো কথা মুখে এল না। পরে ধাতস্থ হয়ে বললাম, তোর কী হয়েছে?

ও সেটার সরাসরি জবাব না দিয়ে বলল, তুই আমাকে না বলেই চলে এলি?

আমি বেশ বিব্রত হই। সত্যি সত্যি আসার আগে ওকে জানাতে ইচ্ছা হয়নি। বললাম, চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, তাই আর বলতে ইচ্ছা হয়নি।

হ্যাঁ, তাই শুনলাম। চাকরি ছেড়ে দিলি কেন?

আসলে, ওই রোগীহীন জায়গায় থাকলে আমি ডাক্তারি ভুলে যাব, এ কারণেই ছাড়া। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো শেষের দিকে। তোর পায়ে কী হয়েছে?

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দাঁড়া সেটা পরে বলছি। আমার নামে রিপোর্ট গেছে, আমি নাকি কয়েদিদের পালাতে সাহায্য করেছি।

শুনে আমি মর্মাহত হলাম। বলিস কি!

হ্যাঁ। কেউ বিশ্বাসই করলো না আমার সন্দেহের কথা। উলটো বলে বেড়াতে লাগলো আমার মাথায় সমস্যা হয়েছে।

আমি থই পাই না। কী বিশ্বাস করলো না?

তুইও তো ঠিকঠাক বিশ্বাস করিসনি, বলেছিলাম না ওই ঔষধের সাথে কয়েদিদের পালানোর একটা সম্পর্ক আছে?

আমি কী বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওর সেই বদ্ধ ধারণা এখনো অটুট।

আমি শান্ত গলায় বললাম, একটা ঔষধের সাথে কয়েদি পালানোর সম্পর্কের ব্যাপারটা একটু উদ্ভট চিন্তা হয়ে যাচ্ছে না? কোনো ঔষধ কোম্পানি নিশ্চয়ই জেল পালানোর ঔষধ বানাবে না!

বানাবে। শফিক দৃঢ় স্বরে বলল। ঔষধ কোম্পানি না হোক, কোথাও না কোথাও কোনো জিনিয়াস কেমিস্ট রয়েছে যে এমন মেডিসিন বানানোর কথা ভাবতে পারে।

কিন্তু সেই ঔষধটা কাজ করবে কীভাবে?

আমার সে প্রশ্নের সরাসরি জবাব শফিক দেয় না। মুখে একটা ফিচলে হাসি ধরে রেখে বলে, তোকে আমি অনেক খুঁজে বের করেছি। তুই পারতি আমার কথা বিশ্বাস করে আমার পাশে থাকতে, একজন ডাক্তারের সায় পেলে আমি তদন্তকারী অফিসারদের কনভিন্সড করতে পারতাম। তুই সেটা না করে পালিয়ে আসলি।

আমি পালাবো কেন! আমি অবাক হলাম বেশ। ওর মাথা পুরোপুরি গেছে।

ওটা পালানোই। তোর ফোনও বন্ধ ছিল।

কিছুদিনের জন্য ছিল। আমার ফোনে সমস্যা হচ্ছিলো। পরে ঢাকায় এসে ঠিক করি।

ওরা আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার চেষ্টা করছে, আমাকে বার বার বলছে রিজাইন করতে, নাহলে নাকি পরিণতি খারাপ হবে। অথচ পালানোর ব্যাপারগুলো সলভ করতে পারলে এটা হতে পারতো একটা মনে রাখার মতো ডিটেকটিভ কেস। একটা শার্লকিয়ান কেস।

আমি মনে মনে না হেসে পারি না। তবে মুখে গাম্ভীর্য ধরে রেখে বলি, তুই বল কীভাবে কাজ করে এই ঔষধ, তোর কী ধারণা?

শফিক তার জবাবে ধীরে ধীরে হুইল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তার মানে কী ওর পায়ে সমস্যা নেই? তারপর ও টেবিলে দুহাত রেখে ঝুঁকে আমার মুখের কাছে আসে। ফিসফিস করে বলে, সেটা বোঝার জন্য আমি গত ছয়মাস নিয়মিত সে ঔষধ খেয়ে যাচ্ছি। এবং আমি প্রমাণ পেয়েছি আমার সন্দেহই ঠিক।

আমি ওর আচরণে ভড়কে যাই।

কী সন্দেহ?

ও ওর ভর দেয়া একটা হাতকে অন্য হাত দিয়ে কনুই আর কবজির মাঝখানে জোরে চাপ দিল। সাথে সাথে মনে হলো হাতটা যেন ভেঙে গেছে, ও আরো ঝুঁকে আসলো আমার দিকে। আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম। কী করছে ও?

কনুই এ যেমন একটা ভাঁজ, একই রকম আরেকটা ভাঁজ তৈরি হলো যেন। হাড় ভাঙার একটা শব্দ হবে সেটা শোনার জন্য আমার কান যেন অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু কোনো শব্দ হলো না। বরঞ্চ ও চাপ ছেড়ে দিতেই

হাত ধীরে ধীরে আবার সোজা হয়ে গেল। আর খেয়াল করলাম, ওর মুখ হাতপা ভীষণ তৈলাক্ত।

বললাম, কী করছিস তুই?

সেটা বলার আগে একই কাজ ও ওর পায়ের সাথেও করলো। বেশ কসরত করে ধীরে ধীরে পা'টা আমার টেবিলে তুলল, তুলে হাঁটুর উপরে হাত দিয়ে আবারো জোরে চাপ দিল। তাতে হাঁটুটা ভাঁজ হলো, কিন্তু স্বাভাবিকের ঠিক উলটোদিকে। আমি আঁতকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি।

আমার প্রতিক্রিয়ায় শফিক হেসে বলল, কী ডাক্তার সাহেব। এবার বিশ্বাস হলো। কুদ্দুস জয়নালরা ওই ঔষধ খেয়ে শরীরের সব হাড়কে নরম করে ফেলেছে। ওরা চাইলেই স্বাভাবিকের চেয়ে তিন চারগুণ ছোটো জায়গা দিয়ে দেহ গলাতে পেরেছে।

কিন্তু সুড়ঙ্গ?

ওটা আসলে সুড়ঙ্গ ছিল না। ওটা কুদ্দুস খুঁড়েছিল ঔষধগুলো লুকিয়ে রাখতে। আমরা বোকারা ভেবেছি সুড়ঙ্গ। ওরা এই ঔষধ খেয়ে নিজেদের যথেষ্ট ফ্লেক্সিবল বানিয়ে গরাদের ছোট্ট জানালা দিয়ে গলে বের হয়ে গেছে।

৫.

শফিকের বক্তব্য অনুযায়ী কয়েদিরা যে ঔষধ খেয়েছে তাতে কোনোভাবে তাদের হাড়ের গঠন পরিবর্তন হয়েছে। সেগুলো হয়ে গেছে অভঙ্গুর ও চাপে আকার পরিবর্তনে সক্ষম। মানে আমাদের কানে বা নাকের মাথায় যে ধরনের হাড় রয়েছেন, যাদের মেডিকেলের ভাষায় বলে কার্টিলেজ, সাধারণ হাড়গুলো সে ধরনের কার্টিলেজে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

হাড়ের বদলে কার্টিলেজ থাকলে সরু জায়গা দিয়ে দেহ গলানো সম্ভব। মানবশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন যোনিপথের মতো সরু জায়গা দিয়ে ওর দেহ বের হতে পারে একই কারণে, ওর দেহের হাড়গুলো তখন কার্টিলেজ হিসেবে থাকে। বড়ো হতে হতে সেসব নরম হাড়গুলো শক্ত হয়ে যায়। শফিকের দাবি অনুযায়ী, ওই ঔষধ উলটো কাজ করছে। হাড়কে উলটো নরম কার্টিলেজ বানাচ্ছে। তাতে প্রধান যে সমস্যা হবে সেটা হলো স্বাভাবিক চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে যাবে শরীর। শফিকের সেটা হয়েছে। পাশাপাশি হাড়ের ক্যালসিয়াম সরে গিয়ে চামড়ায় জমা শুরু করবে, তাতে চামড়া হয়ে উঠবে ভীষণ শুষ্ক। ধারণা করি, এ কারণে এই ঔষধ সেবনকারীদের আলাদা করে তেল মেখে শরীর তৈলাক্ত রাখতে হয়।

কয়েদিরা শফিকের তুলনায় কম মাত্রায় খেয়েছিল–আমার ধারণা, তাই ওদের হাঁটাচলায় জোর না থাকলেও শফিকের মতো হুইল চেয়ারের সাহায্য নিতে হয়নি।

পুরো ব্যাপারটা একটা মেডিকেলিয় ব্যাখ্যা দাঁড় করালেও আমি তাও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এমন একটা ঔষধ থাকতে পারে সেটা অবিশ্বাস্য!

শফিক সেদিন আমার সাথে কথা শেষ করে চলে গিয়েছিল আবার সৈয়দপুরে। আমি ওকে অনুরোধ করেছিলাম, ও যেন অবশ্যই সে ঔষধটা খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং প্রচুর ক্যালসিয়াম জাতীয় ঔষধ খাওয়া শুরু করে যাতে আবার কার্টিলেজগুলো হাড় হওয়া শুরু করে।

পরে ওকে ফোন দিয়ে আর পাইনি। আমি ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করলেও পারছিলাম না। ঔষধটা পরীক্ষা করার প্রবল ইচ্ছা হলো। মনে পড়লো, সৈয়দপুরের রেল-হাসপাতালে আমার চেম্বারে ওই ঔষধের একটা কৌটা থাকার কথা। সেটা যদি গিয়ে পাওয়া যায় তাহলে ঔষধটা ল্যাবে পাঠিয়ে ওটার উপাদান পরীক্ষা হয়তো করা যাবে।

নতুন যে রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার এসেছেন তাকে ফোন করলাম একদিন।

বললেন, ওহ, আপনার জিনিসপত্র তো আমরা স্টোররুমের কোথাও রেখে দিয়েছি। কোনো কৌটার কথা তো মনে পড়ছে না। পেলে রেখে দেব।

কথার টোনে বুঝলাম দায়সারা উত্তর। সেটার প্রমাণ পেলাম কয়েকদিন বাদে আবার ফোন দিয়ে।

প্রথমে মনেই করতে পারলেন না, এর আগেরবার কীসের জন্য ফোন দিয়েছিলাম। পরে মনে পড়ায় বললেন, আরে ভাই, এত জরুরি যদি হয় কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে নেন না, অথবা আপনি আসেন। চা খেয়ে যান।

এরপর আর ফোন দেওয়া চলে না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, একদিনের জন্য হলেও আবার সৈয়দপুর যাব।

নানা ব্যস্ততায় সাথে সাথে যাওয়া হলো না। আজ যাবো কাল যাবো করে দেরি হচ্ছিলো, ওদিকে কোর্সের চাপেও দিশেহারা ছিলাম, শার্লক হোমসগিরি করার ফুরসত পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু একটা ফোন কলে যাওয়াটা আবার জরুরি হয়ে পড়লো।

শফিকের সাবেক স্ত্রী ফোন দিয়েছে। শফিককে পাচ্ছে না।

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের তো ডিভোর্স হয়েছে রিসেন্টলি?

হ্যাঁ, ও আমাকে আপনার নাম্বার দিয়ে রেখেছিল যখন আপনি সৈয়দপুরে ছিলেন।

আচ্ছা।

ডিভোর্স রিলেটেড একটা ডকুমেন্টের জন্যই ওর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গত একসপ্তাহ ধরে ওকে ফোনে পাচ্ছি না। অফিসে খোঁজ নিয়েও দেখলাম, কেউ কিছু জানে না।

বলেন কি?

ভাইয়া, কাইন্ডলি একটু দেখবেন, আপনার পরিচিত কেউ যদি থাকে ওখানে?

আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম আমিই যাব। বললাম, আপনি ভাববেন না, আমি নিজেই আগামীকাল সৈয়দপুর যাব।

শুনে ভদ্রমহিলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

পরদিন সৈয়দপুর গিয়ে আমি সরাসরি শফিক যেখানে থাকতো সেখানে পৌঁছাই। সৈয়দপুরের বিহারি-পল্লীর কাছে একটা ছ'তলার বাড়ির চারতলায় শফিকের অ্যাপার্টমেন্ট। নিচের দারোয়ান জানালো শফিক সাহেব খুব একটা বাইরে বের হন না, অসুস্থ। একটা ছেলে এসে বাজার সদাই, রান্নাবান্না করে দেয়।

এখন আছে উপরে?

থাকার কথা, বাইর হইতে তো দেখি নাই।

ওই ছেলেটা?

পোলাডাও কয়দিন ধরে আসে না।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে উপরে উঠে যাই সিঁড়ি বেয়ে।

প্রথমে কলিংবেল টিপে, পরে ধাক্কাধাক্কি করেও ভিতর থেকে কোনো সাড়া পাই না। ভীষণ একটা আশঙ্কা দানা বেঁধে ওঠে।

দ্রুত দারোয়ানকে নিয়ে আবার উপরে উঠি। বাড়ির মালিকের ছেলেও আসে সাথে। সবাই মিলে ধাক্কাধাক্কি করে, দরজা ভেঙে আমরা ভিতরে ঢুকি।

হরর সিনেমার দৃশ্যের কথা আবার মনে হয়। বুঝতে পারি সামনে ভয়ংকর কিছু অপেক্ষা করছে, বীভৎস কিছু, কিন্তু সেই ভীষণ অস্বস্তিকর দৃশ্যের যেন নিদারুণ আকর্ষণ ক্ষমতাও আছে। সে আকর্ষণে আমরা এগিয়ে যাই ধীরে ধীরে, বাইরের রুম থেকে ভিতরের রুমে।

বেডরুমের কাছে এসে আবারও থমকাই। এ দৃশ্য দেখার জন্য কী আমি প্রস্তুত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার হাত চলে যায় দরজার নবের দিকে।

ধীরে ধীরে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করি।

রুমের ভিতর আলো জ্বালানো নেই, পর্দাও টানা। দারোয়ান হঠাৎ সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে লাইট জ্বেলে দেয়। তাতে পুরো বিছানায় কী রয়েছে তা দৃশ্যমান হয়।

একটা বিস্তৃত লালচে চামড়া। বেশ করে তেল মাখানো, পিচ্ছিল।

এক পাশে মানুষের মুখের মতো, একটু উঁচু হয়ে আছে, চ্যাপ্টা বাতাস ছাড়া একটা বলের মতো কিছুতে নাক চোখ বসানো, চোখগুলো ওদের গোলাকার আকৃতি নিয়ে প্রকটভাবে বের হয়ে আছে। হাতপাগুলোও বিছানার দুপাশে ঝুলে আছে। বিছানায় ছড়িয়ে থাকা এক ভীষণ গা ঘিনঘিনে চামড়া সর্বস্ব দেহ।

না দেহটি মৃত নয়। ভালোমতো লক্ষ করে দেখি হৃৎপিণ্ড এখনো সচল, ফুসফুসের জায়গাও ওঠানামা করছে।

দারোয়ান এবং বাড়িওয়ালার ছেলে বরফের মতো জমে ছিল। হঠাৎ সম্বিত পেয়ে ওরা অগ্রসর হলো হাতের কাছের ভাঙা কাঠের টুকরো নিয়ে।

মানুষ অসচরাচর সহ্য করতে পারে না। অসহ্যকে নিবারণ করেই ওরা নিজের স্বস্তি নিশ্চিত করে।

বিপদ বুঝতে পেরে শফিকের দেহে আলোড়ন তৈরি হয়। একটা ফ্যাসফ্যাস শব্দ বের হয় ওর চ্যাপ্টা মুখ থেকে, খাঁচায় আটকানো বনবেড়ালের মতো একটা শব্দ তৈরি হয় তাতে। তারপর হঠাৎ ওর পুরো দেহটা একটা বৃহৎ সরীসৃপের মতো মোচড় দিয়ে বিছানা থেকে নেমে যায় এবং চোখের পলকে অনায়াসে জানালার শিক গলে সরসর করে বাইরে বের হয়ে যায়।

শফিককে বা শফিকের ওই রূপান্তরিত দেহকে আমরা আর খুঁজে পাইনি।

নির্বাণ আশ্রম



১.

একটা নিঝঝুম দ্বীপের মতো নীরব জায়গা। পাখির ডাক ছাড়া অন্য কোনো শব্দ কানে আসেনি গত আধ-ঘন্টা ধরে। এতক্ষণ ভালো রোদ ছিল, এখন নীল আকাশ ধীরে ধীরে ঘোলাটে হয়ে উঠছে, মেঘের আনাগোনা বাড়ছে–বাতাসে অচেনা ঝাঁঝালো সুবাস। তাড়াতাড়ি পা না চালালে বিকালের আগে পৌঁছাতে পারবো না।

আমার আগে আগে এক কিশোর ছেলে হাঁটছে। ছেলেটার নাম ইকু, দশ বারো বছর বয়স, পথে পরিচয়, এই মাত্রই।

জায়গাটা দুর্গম বলা সমীচিন হবে না। তবে নির্জন। ময়মনসিং শহর থেকে দুইমাইল দূরে, কাছেই ব্রক্ষপুত্র নদী, তবে এখনো আমার চোখে পড়েনি। একটা ভেজা শ্যাওলাগন্ধা বাতাস বইছে, নদীর ঘ্রাণই হবে। বুকভরে শ্বাস নিলে কেমন এক কীরকম যেন অনুভূতি হয়। ছেলেবেলার অস্পষ্ট স্মৃতি হানা দেয় চাপা কোনো ব্যথার মতো।

গ্রামের নাম কাসুন্দিপুর। ঠিকানা ধরে প্রথমে একটা বাজারে আসি, সরকার বাড়িতে যাব শুনে এক বৃদ্ধ ইকুকে আমার সাথে জুড়ে দেন। সরকার সাহেবের অতিথি জেনে মনে হলো আলাদা সমীহ করলেন।

বাতাসের শীত শীত ভাবটা গায়ের পাতলা শার্টটায় মানছে না। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক শামুকভাঙা উড়ে গেল। ইকুও মনোযোগ দিয়ে ঝাঁকটা দেখলো। তারপর আনমনে বলল, এইবার মেলা পাখি পড়ব সরকার বাড়িতে।

মানে আমরা যেখানে যাচ্ছি?

জ্বি, সরকার সাহেবের জমি পাখিরা অনেক পছন্দ করুইন। আর হে পাখি মারুইন না।

আশ্রমের মালিকের নাম তমিজউদ্দিন সরকার। ওনার নিমন্ত্রণেই আমি এসেছি।

একটা পাঁচিল ঘেরা জায়গার দেখা পেলাম খানিকবাদে। উঁচু গেট। গেটে একজন মোটাসোটা দারোয়ান, দারোয়ানের পরনে খাকি পোশাক। হাতে একটা বন্দুক! বন্দুক দেখে স্বভাবতই চমকালাম।

দারোয়ান জিজ্ঞেস করলো, আপনে ডাক্তার সাব?

হ্যাঁ।

আইচ্ছা, আসেন।

ইকু আমার থেকে বিদায় নিল। ও আর ভিতরে আসবে না। মনে হলো, ভিতরে আসতে সে ভয় পাচ্ছে। আমি আর আপত্তি করলাম না।

আমার সাথে তেমন কোনো মালামাল নেই। একটা ছোটো স্যুটকেস আর কাঁধে ব্যাগ। স্যুটকেসটা দারোয়ান নিয়ে নিল, আমি তার পিছু পিছু রওনা হলাম। গেট থেকে তিন-চার মিনিটের হাঁটা দূরত্বে একটা দোতলা বাড়ি। বেশ বড়ো একটা জায়গা দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা। ভেতরে বাহারি নান্দনিক গাছপালা, খুব পরিকল্পনামাফিক বলা যাবে না, তবে গাছপালাগুলোর যত্ন নেয়া হয় সেটা বোঝা যায়। যদিও বুনো-ঝোপঝাড় ভাবটা কাটেনি। সামনের দোতলা বাড়িটা পুরোনো, বড়ো টানা বারান্দা, সিঁড়িতে সিংহমাথার দুটো মূর্তি, দেখে বোঝা গেল এটা প্রাচীন কোনো জমিদার বাড়ি, তবে অনেক সংস্কার হয়েছে। জানালা দরজাগুলো আধুনিক, থাইগ্লাসের কালো জানালা আর দরজাগুলো ভারী নকশাদার নতুন কাঠের। বিকেলের শেষ রোদে আলো ছায়ার এক অভূতপূর্ব শোভা হয়ে আছে বাড়িটা। বাউন্ডারির ভেতরে আরো কয়েকটা ভবন আছে, একটু দূরে। দোতলা আর একতলা সবই, এর বড়ো নয়। সরকার সাহেবের পূর্বপুরুষ এই এলাকার জমিদার ছিলেন, সেটা কেউ না বলে দিলেও এসব দেখে অনুমান করা যেত। তার এই জায়গাটা রীতিমতো বড়োসড়ো একটা রিসোর্টের মতো। অবশ্য সে কারণেই বোধহয় এখন এটাকে তিনি আশ্রমে রূপান্তর করতে পেরেছেন, তার বাবা এর সূচনা করে গেছেন। এটা এক অদ্ভুত আশ্রম, বিস্তারিত পরে বলছি।

দোতলার বারান্দা থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে তমিজুদ্দিন সরকার নিচে নেমে এলেন।

আরে ডাক্তার সাহেব চলে এসেছেন! তিনি সহাস্যমুখে এগিয়ে আসলেন।

ভদ্রলোককে আমি প্রথম দেখলাম, এর আগে ফোনে কথা হয়েছে। বয়স আশি থেকে নব্বইয়ের মাঝে হবে। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, ধবধবে সাদা চুল মাথা ছেড়ে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরনে একটা অ্যাশ কালারের আলখাল্লার মতো। পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল। চোখে সোনালি ফ্রেমের একটা চশমা আর হাতে নতুন মডেলের ফোন না থাকলে তাকে গত শতাব্দীর কোনো মানুষ হিসেবে চালিয়ে দেয়া যেত।

আমি গিয়ে করমর্দন করলাম, লোকটার হাতটা ভীষণ শীতল আর খরখরে শুকনো। তবে জোর আছে বলা চলে। ইচ্ছে করেই মনে হলো শক্ত করে আমার হাতটা পাকড়াও করে রাখলেন। ওনার বাম হাতে কোনো সমস্যা আছে, হাতটা একটা কাপড়ে ঢেকে রেখেছেন। অনুমান করলাম প্যারালাইজড।

আমি যে কী খুশি হয়েছি ডাক্তার সাব আপনি আসছেন, আল্লার কাছে হাজার শুকরিয়া। আমার আশ্রমে গত কয়েকমাস ধরে ডাক্তার নাই, কী যে একটা মুশকিলোর ব্যাপার। এক আধটু অসুখের জন্য আমার যেতে হয় ময়মনসিং হাসপাতালে!

আমারও ভালো লাগলো জায়গাটা দেখে। আমি ভদ্রতা করে বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আগের ডাক্তার চলে গেলেন কত দিন হলো?

ওই যে বললাম, তিনমাস হইলো। উনি ছিলেন আমার কোনো ভাবনা ছিল না, চলে যাওয়ার পর তো আর কাউকে পাই না। এই নির্জনে আইসা কেউ থাকতে চায় না। কেনই বা থাকবে বলেন, সবার তো নির্জন জায়গা ভালো লাগে না, আর বেতনই বা কী এমন দিতে পারি। তবে ডাক্তার সাহেব, যদি মানিয়ে নিতে পারেন দেখবেন একটা শান্তি আছে এই জায়গায়, কাজ তো তেমন কিছু না, আমার এখানকার রোগীদের একটু দেখবেন–চেকআপ করা–এদের তো বড়ো কোনো সমস্যা নাই। আর আমাদের নাদিম বাবুর্চির হাতের রান্নায় খুশি হইবেন, প্রতিদিন নদীর তাজা মাছ আসে। আশা করি যত্ন আত্তিতে নাখোশ হইবেন না।

আমি বললাম, ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি একা মানুষ, সামান্য খাওয়াদাওয়া করি।

এরমধ্যে আরেকটি ছেলে এল। সরকার সাহেব তাকে দেখিয়ে বললেন, হাফিজের সাথে আপনার রুমে যান। ওখানে স্নানের ব্যবস্থা আছে। স্নান করেন, চা নাস্তা পাঠায় দিচ্ছি। বিশ্রাম করেন, সন্ধ্যার সময় আবার দেখা হবে।

হাফিজ এই বাড়ির কেয়ারটেকার। বয়স ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশের মধ্যে হবে, পরনে ইস্ত্রি করা প্যান্ট শার্ট, মুখে একগাল দাড়ি, মুখে বিনীত ভঙ্গি। দারোয়ান থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

আমার জন্য বরাদ্দ রুমে ঢুকে মন ভালো হয়ে গেলো। খুব পরিপাটি সুন্দর একটা রুম, দোতলার এক মাথায়। জানালা দিয়ে দূরের বন-জঙ্গল, পাহাড় দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে চমৎকার একটা জ্বলজ্বলে ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং।

আমি কাপড় ছেড়ে গোসল করে নিলাম, দেখলাম ইতোমধ্যে নাস্তা দিয়ে গেছে। রুটি-ডিমপোচ, কয়েকপদের ভাজি তরকারি, টিপটে চা। যত্ন আত্তির অভাব হবে না সেটার প্রমাণ পেলাম। নাস্তা সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্য আধশোয়া হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

২.

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, বুঝতে পারিনি। একটা অচেনা শব্দে ঘুম ভাঙল। রুমে আলো নেই, বুঝলাম সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এতক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন ঘুমিয়েছি।

মনে হলো কোনো জন্তু চিৎকার করছে। খানিক পর পর ঘরঘর আওয়াজ করছে। আওয়াজটা জানালা দিয়ে আসছে। আমি ভয়ে ভয়ে জানালার কাছে আসি, জানালায় মোটা গ্রিল দেয়া তবে পাল্লা খোলা। পাল্লা লাগাতে যাব, এমন সময় নিজের অজান্তে আঁতকে সরে গেলাম, মনে হলো জানালার কাছ থেকে একটা মাথা সরে গেল।

আমি দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে নিচে নামলাম। সন্ধ্যার পর জায়গাটা মতো অন্ধকার হয়ে যাবে সেটা আন্দাজ করতে পারিনি। একটা মিশমিশে কালো পর্দা দিয়ে যেন পুরো জায়গাটা কেউ মুড়ে রেখেছে। নিচে এক বয়স্ক লোক হারিকেন জ্বালিয়ে দেয়ালে দেয়ালে ঝুলাচ্ছে। তার কাছে গিয়ে সরকার সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

উনি বললেন, সরকার সাব তো মিটিং করতেছে।

মিটিং?

জ্বি, কাচারি ঘরে মিটিং, মাঝে মধ্যেই হয়।

আমি আর ও প্রসঙ্গে গেলাম না। বললাম, চাচা, এখানে ইলেকট্রিসিটি নাই?

আছে, বাবা। লোড শেডিং। রাইতে দুই-তিন ঘণ্টা বাতি থাহে।

কী মুশকিলের কথা!

বাড়ির সামনের দাওয়া থেকে ঘুরে আসবো চিন্তা করলাম।

বাড়ি থেকে বেড়ুতে মনে হলো অন্ধকারটা একটু কমে এল। আকাশ খুব পরিষ্কার, নক্ষত্রের আলোয় চারপাশটা এক মায়াবী মৃদু আলোয় ভরে আছে। দোতলা বাড়ির পেছনের দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে, সেটা ধরে এগুতে থাকি। একটু সামনেই একটা ভবনে কিছু একটা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে, ওখানে ইলেকট্রিসিটিও আছে–তবে জেনারেটর হবে–জেনারেটরের মৃদু আওয়াজ

পাচ্ছি। ভবনটা একতলা, দিনের বেলা আজকে ভালো মতো দেখার সুযোগ পাইনি, বড়ো একটা হলরুমের মতো মনে হলো। জানালায় পর্দা টানা, পর্দা ভেদ করে আসা আলোয় আশপাশটা আলোকিত হয়ে আছে।

এটাই কাচারি ঘর হবে। এখানেই হয়তো সরকার সাহেব তার কর্মচারীদের নিয়ে মিটিং করছেন।

এই মিটিংয়ে আমি থাকতে পারবো কিনা সে সংশয় ছিল, তাই সরাসরি ঢুকে গেলাম না। বাইরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

ভিতরে হঠাৎ হট্টগোল হচ্ছে মনে হলো, স্পষ্ট শুনলাম একজন বলছে, হুজুর আমাকে মাফ করে দেন, এই ভুল আর হবে না।

তারপর সরকার সাহেব চাপা গলায় কিছু বললেন, ভালো বুঝতে পারলাম না।

এসব শোনার পর আমি ফেরত যাব সিদ্ধান্ত নিলাম, হয়তো কোনো অভ্যন্তরীণ ঝামেলা হচ্ছে–আমার না থাকাই ভালো হবে। আমি আবার মূল বাড়িটায় ফিরে এলাম। হারিকেন টানানো করিডোর পার হয়ে নিজের রুমে চলে আসলাম।

আমার রুমেও দেখলাম একটা হারিকেন দিয়ে গেছে। ভাবলাম বসে না থেকে অন্তত একটা বই পড়ি, যদিও পড়তে হবে হারিকেনের এই মরা আলোয়। ডিন কুন্টজের একটা হরর বই আছে ব্যাগে, এই পরিবেশে পড়ার জন্য খুব ভালো।

***

মাসখানেক আগের কথা। আমার ছাতকের চেম্বারে এক তরুণ রোগী এসেছিল। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। স্থানীয় মনে হলো না, ততদিনে আমার ছাতকে এক বছর হয়ে গেছে। স্থানীয়দের মুখ দেখেই বলে দিতে পারি স্থানীয় কে। ছোটো জায়গা, সবার সাথেই কোনো না কোনোভাবে দেখা হয়ে গেছে।

খুব অস্বস্তি নিয়ে আমার সামনে বসলো ছেলেটি। বসতে কষ্ট হচ্ছিলো কোনো কারণে, মনে হলো সারা গায়ে ছেলেটার প্রচণ্ড ব্যথা, খুব কসরত করে ধীরে ধীরে বসলো। শারীরিক গঠন বেশ ভালো, শক্ত পোক্ত। হয় খেলাধুলা বা নিয়মিত শরীরচর্চা করে। চুল উস্কোখুস্কো, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। পরনে একটা চেক চেক শার্ট আর গ্যাবারডিনের প্যান্ট, পায়ে স্লিপার।

কী অসুস্থতা জিজ্ঞেস করতে একটা অদ্ভুত কথা দিয়ে শুরু করলো।

ডাক্তার সাহেব, আমি জানি না এটা আসলে কোনো রোগ কিনা! তবে আমার উপর অভিশাপ লেগেছে।

শুনে আমি চমকে উঠলাম। অভিশাপ?

জ্বি। আমার বাড়ি সিলেটে গোলাপগঞ্জে। এখানে এসেছি চাকরির উদ্দেশ্যে।

এখানে কোথায় কাজ করেন?

একটা এনজিওতে, ডেনমার্কের এনজিও। ওদের একটা রুরাল প্রজেক্ট আছে এখানে। আমার কাজ ছোটোখাটো, সপ্তাহে তিনদিন ফিল্ড ভিজিট করতে হয়, তাই এখানেই থাকা শুরু করেছি। কয়েকমাসের জন্য এসেছি।

আচ্ছা সমস্যা বলুন।

দেড় বছর আগে আমি একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। প্রেমের বিয়ে, বিয়ের আগে খুব ঝামেলা হয়, মেয়ের পরিবার কেউ আমাকে মেনে নেয়নি।

কেন?

অনেক ব্যাপার ছিল, সেসব বলে আপনার সময় নষ্ট করবো না। আমি হিন্দুধর্মালম্বী, ও মুসলিম ছিল, তাছাড়া আমি নিতান্তই সাধারণ পরিবারের ছেলে, পড়াশোনা করিনি ভালো কোথাও থেকে, স্বভাবতই ওর পরিবার আমাদের সম্পর্কে রাজি ছিল না। তনু বলতে পারেন আমাকে বিয়ে করে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায় ওর পরিবার থেকে।

তনু আপনার স্ত্রী?

হ্যাঁ, তনু... ছেলেটা থামে, মনে হলো বলতে কষ্ট হচ্ছে, ও মারা গেছে সাত আট মাস হলো।

স্যরি, কীভাবে?

ও আত্মহত্যা করে।

শুনে আমি কিছুটা নীরব হয়ে যাই।

ছেলেটি আবার শুরু করে। তনুর সাথে বিয়ের যখন ছয়মাস, তখন থেকে লক্ষ করি ও ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছে। ওর মুখে হাসি দেখতামই না। ও ওর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কষ্ট পাচ্ছিলো। তবে ও যে এতটা কষ্টে ছিল সেটা বুঝতে পারিনি। একদিন ঘরে ফিরে আবিষ্কার করি ও আত্মহত্যা করেছে।

কীভাবে আত্মহত্যা করলো?

গলায় ফাঁসি দিয়ে।

তারপর খানিকটা থেমে বলল, আমি একটা কাজে সেদিন রাতে বাসায় ছিলাম না। পরের দিন ফিরে এসে লাশটা পাই। সিলিং থেকে ঝুলছিল। একটা কাপড়কে ফাঁসির দড়ি বানিয়েছিল। আমি যখন লাশটা নামাই সেটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে ছিল।

আমি মনে মনে বললাম, রিগর মর্টিস। মৃত্যুর ছয় ঘণ্টা পর পুরো শরীর শক্ত হওয়া শুরু করে।

আমার সবসময় মনে হয় ওর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আমি ব্যর্থ হয়েছি ওকে মানসিক শান্তি দিতে।

আমি একটু আপত্তি করে বললাম, না সেভাবে ভাবাটা আসলে জরুরি না। তবে হ্যাঁ, হয়তো আপনার স্ত্রীর চিকিৎসার দরকার ছিল।

হ্যাঁ সেটাই। আমি সেটা বুঝতে পারিনি। তো, ও মারা যাওয়ার ঠিক একমাস পর থেকে আমি লক্ষ করি আমার শরীর শক্ত হতে শুরু করেছে।

মানে?

মানে আমার শরীর পাথরের মতো হয়ে যাচ্ছে। বলে ছেলেটা ওর বা হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে।

আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখি, হাতটা আসলেই পাথরের মতো শক্ত। সাদাটে হয়ে গেছে। চামড়া শক্ত হয়ে নখের মতো হয়ে গেছে কনুই থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত।

এই হাতটা এখন পুরোপুরি অচল। শরীরে আরো অনেক জায়গায় একই ব্যাপার হচ্ছে। মাংস পাথর হয়ে যাচ্ছে। তনু মারা যাওয়ার পর ওর শরীর ধরে যেমন অনুভূতি হয়েছিল, তেমনটাই হয় আমার শক্ত হওয়া শরীরের অংশ ধরলে।

আমি ছেলেটাকে আরো পরীক্ষা করে দেখলাম। যেটা প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম দেখলাম তা-ই। ওর মাংসপেশিগুলো ধীরে ধীরে হাড় হয়ে যাচ্ছে শরীরের নানা স্থানে। খুব সম্ভবত ফাইব্রোডিসপ্লেসিয়া অসিফিকানস প্রগ্রেসিভা। খুব দুর্লভ রোগ।

আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, এটা এক ধরনের রোগ। জেনেটিক ডিসঅর্ডার। সাধারণত অল্পবয়েসেই সমস্যা ধরা পড়ে। কারো কারো দেরি হতে পারে। এর সাথে মৃত্যুর পরে কারো শরীর শক্ত হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনার সাথে সম্পর্ক নেই। সে এটাকে অভিশাপ মনে করছে দেখে সম্পর্ক আছে মনে হচ্ছে।

এটা যে একটা রোগ এবং সেটার যে একটা নামও আছে জেনে মনে হলো ছেলেটা স্বস্তি পেল। তাই এ রোগের যে ভালো কোনো চিকিৎসা নেই

এবং ধীরে ধীরে পুরো শরীর যে ওর ক্রমে হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে সেটা বলতে গিয়ে বেশ কষ্ট হলো। কিছু নিয়ম কানুন মেনে চললে হাড় হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ধীর করা যাবে–সে বিষয়ে শুধু পরামর্শ দিলাম।

যাওয়ার আগে আমি ছেলেটার নাম ঠিকানা নিয়ে রাখলাম। এমন এক দুর্লভ রোগীর নিয়মিত খোঁজ নেয়াটা আমার কর্তব্য মনে হলো।

নাম সুজন পাল, পিতা নবারুন পাল। বয়স ২৩। চৌধুরী পাড়া, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

৩.

পরদিন ঘুম ভেঙে নিচে নেমে দেখি তমিজুদ্দিন সরকার আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ডাক্তার সাব, আসেন। একসাথে নাস্তা করি।

দাওয়াখানায় বসার কাপড় পেতে নাস্তার আয়োজন করা হয়েছে। রুটি, হাসের মাংস, কয়েকপদের সবজি, চিতই পিঠা, পোচ ডিম। এসব শেষ করে খেজুর গুড়ের চা।

তমিজুদ্দিন বললেন, আয়োজন সামান্য। এই দুর্গম জায়গায় কী আর মেলে!

আমি হেসে বললাম, এই নাস্তা রোজ খেলে কদিন বাদে গেট দিয়ে বের হওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে, আর বলছেন সামান্য!

আমার কথায় তমিজুদ্দিনের মুখে হাসি ফুটলো।

আজকে আপনাকে দাওয়াইখানার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেব। গতকাল ওরা সাফসুতোর করেছে।

দাওয়াইখানা?

হ্যাঁ, কাচারিঘরের পশ্চিমে একটা দোতলা বিল্ডিং দেখছেন না। ওটাই তো। ওর নিচে আশ্রমের কয়েকজন থাকে। উপরে আপনার বসা আর থাকার জায়গা।

আচ্ছা।

শোনেন ডাক্তার সাব, আপনার সাথে ফোনে তো আগেও এ ব্যাপারে কথা হয়েছে অল্পস্বল্প। আমার এখানে যারা রোগী হিসেবে আছে তারা আপনার চোখে রোগী মনে হতে পারে, কিন্তু এই আশ্রমের নিয়মে তারা রোগী না। তাদের জীবনটা অধিকাংশ মানুষের মতো না শুধু।

আমি সে কথায় হেসে সম্মতি জানালাম। বললাম, হ্যাঁ তাতো বটেই। এজন্যই তো আপনার এখানে কাজ করতে আমার ইচ্ছা হয়েছে। আমাদের মেডিকেল সায়েন্স সংখ্যালঘুদের রোগী ভাবতে পছন্দ করে।

এই আশ্রমটা তৈরি আমার আব্বাজানের হাতে–সেটাও বোধহয় আপনি শুনছেন। আব্বাজানের নিজেরও একটা সমস্যা ছিল। এই জন্য সে বাড়ির বাইরে বের হইতো না। কিন্তু তার তখন মনে হইলো এমন মানুষ অনেক আছে যাদের সমাজ গ্রহণ করে না, তাদের জন্য তিনি পরে তার বাড়ি, জমি-জমা, সহায় সম্পত্তি নিয়ে এই আশ্রম বানালেন।

আপনার বাবা খুব মহৎ মানুষ ছিলেন।

হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে আমি নিজে এত মহৎ না, আব্বাজানের এই সব কাজ আমার ভালো লাগতো না। তাই আমি যৌবনের পুরো সময় বাড়িতে থাকি নাই। শেষ বয়সে এসে আশ্রমের হাল ধরছি। এখন অবশ্য ভালোই লাগে।

আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী? ওনারা কই?

স্ত্রী গত হয়েছে তাও বছর কুড়ি হবে। ছেলে মেয়ে কেউ দেশে নাই, কোনো দিন আর আসবো বলেও মনে হয় না।

দাওয়াই খানায় পৌঁছাবার রাস্তায় কয়েকজন রোগীর দেখা পেলাম। সামনে একটা মাঠের মতো জায়গা আছে, পাশেই পাড় বাঁধানো পুকুর। মাঠে একটা ছেলেকে দেখলাম যে দৌঁড়ে আমাদের দিকে আসলো। এসেই সরকার সাহেবকে জড়িয়ে ধরলো। দেখে বুঝলাম ডাউন সিনড্রোমের রোগী। কোনো এক বিচিত্র কারণে এই জেনেটিক রোগের সব রোগীই দেখতে একই রকম হয়। মনে হয় তারা যেন ভিন্ন কোনো দেশের মানুষ।

ছাড় বাপ, সরকার সাহেব আদর করে ছেলেটাকে বলল। নাস্তা খাইছস?

ছেলেটা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

আমার দিকে ফিরে বললেন, আশ্রমে ওরা বারো জন আছে। নানা জেলা থেকে আসছে। কিন্তু দেখলে মনে হয় তারা ভাইবোন।

আমি তাতে সম্মতি জানালাম। তাই মনে হবার কথা।

ডাউন সিনড্রোমের রোগীদের অন্যদের সাথে যোগাযোগে সমস্যা থাকে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ খুব সম্ভবত ভালো ভাবেই করতে পারে। প্রকৃতি তাদের একটা বাড়তি ক্রোমোজম দিয়ে পাঠায়। তাতে তারা হয়তো আরো নিখুঁত মানুষ হিসেবে জন্মায়। আজীবন তারা থাকে শিশুদের মতো। সাধারণ চিকিৎসা বিদ্যায়–তারা সারানো যায় না এমন রোগী।

দাওয়াইখানার মুখে আরেকজন রোগীর সাথে দেখা হয়। তার সারা মুখ, হাত পায়ের অনাবৃত অংশ ঢেকে আছে ছোটো ছোটো টিউমারে। দেখলে একটা অস্বস্তি কাজ করে। নিঃসন্দেহে নিউরোফাইব্রোমার রোগী। এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, যার কারণে চামড়ায় এমন অসংখ্য হাজারে হাজারে টিউমার হয়।

সরকার সাহেবকে দেখে রোগীটি সালাম দেয়। সরকার সাহেব হেসে তার গায়ে হাত বুলায়, কীরে বেটা, ভালো আছিস?

জ্বি চাচাজান, আপনার দোয়ায়।

সরকার সাহেব আমার দিকে ফিরে বলল, ওর নাম জলিল। ওর মতো আরো তিনজন আমার আশ্রমে আছে। এরা নিজেদের এলাকায় খুব কষ্টে ছিল। বাড়ি থেকে বাইর হইতে পারতো না।

দাওয়াইখানার ভবনটা আমার পছন্দ হলো। কোনোভাবেই এটাকে হাসপাতালের সাথে মেলানো যাবে না। কয়েকটা রুম কেবল আছে যেখানে ঔষধপত্র, রোগীর বেড, ছোটোখাটো সার্জারির জিনিসপত্র আছে। তাছাড়া পুরোটাই একটা থাকার ঘরের মতো, টানা বারান্দা। এখানে রোগীরা এক এক কক্ষে থাকে, সাধারণত একই ধরনের রোগীরা একই কক্ষে বা পাশাপাশি কক্ষে থাকে।

রুমে রুমে গিয়ে তাদের সাথে দেখাও করলাম, গোঁদ রোগের কয়েকজন রোগী আছে। সারাগায়ে মাছের মতো আইশে পরিপূর্ণ অ্যাডভান্স স্টেজের কয়েকজন সোরিয়াসিসের রোগী পেলাম। এটা এক ধরনের চামড়ার রোগ, ছোঁয়াচে না তবে এর ভালো কোনো চিকিৎসাও নেই। দুটি কনজয়েনড যমজ রয়েছে, অর্থাৎ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত যমজ সহোদর, এক জোড়া রোগীর মাথার সাথে মাথা সংযুক্ত, অন্য জোড়াটি পিঠের সাথে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম, এখানে এমন কোনো রোগী নেই যারা একজন থেকে অন্য জনে রোগ ছড়াতে পারে। সেটা হলে আবার একসাথে সব ধরনের রোগী একই ভবনে রাখা যেত না।

দেখলাম প্রত্যেকটি রুমেই রোগী অনুযায়ী আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন সংযুক্ত যমজদের আসবাব পত্র, টয়লেট ওদের জন্য সুবিধা করে বানানো। গোঁদরোগের রোগী যাতে সহজে চলাচল করতে পারে এমন করে হুইল চেয়ারের মতো চাকা যুক্ত আসবাবপত্র। ডাউন সিনড্রোমের রোগীদের ঘরগুলো বাচ্চাদের খেলাঘরের মতো। আমি বলা যায় সব দেখে বেশ মুগ্ধই হলাম। আমার কাজও খুব সামান্য। মূলত রোগীদের চেকআপ করা, তাদের

কোনো সমস্যা হলে ঔষধ দেয়া, তাদের জন্য সুবিধাজনক কিছু আনাতে হলে সেটা ম্যানেজারকে জানানো ইত্যাদি।

আমাকে সব বুঝিয়ে দেয়ার পর সরকার সাহেব দুপুরের দিকে চলে গেলেন। বললেন, তিনি এখন একটু শান্তিতে থাকতে পারবেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এখানে কোনো ডাক্তার না থাকায় তার খুব দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিলো।

যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সব রোগী তো এখানেই আছে? আর কেউ কি বাকি আছে?

তিনি আমার প্রশ্নে একটু চমকালেন মনে হলো। বললেন, ডাক্তার সাব, কে রোগী আর কে রোগী না সেটা কে বলতে পারে?

আমি হেসে বললাম, তা ঠিক বলেছেন। আমি বলতে চাইছিলাম, আর এমন কেউ আছে কিনা যার সাথে দেখা হয়নি।

হ্যাঁ, আরো কয়েকজন আছে। যারা এখানে থাকে না। আস্তে আস্তে তাদের সাথে আপনার দেখা হবে। এই বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না, কেমন একটা তাড়াহুড়ার ভাব করে চলে গেলেন।

কেন যেন একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো তার কাণ্ডে। *তিনি কি কিছু আন্দাজ করলেন, কেন আমি এই প্রশ্ন করেছি?*

৪.

তমিজুদ্দিন সরকারের বাপ, আলাউদ্দিন সরকার ছিলেন ময়মনসিংয়ের বড়ো জমিদার। ঢাকার নওয়াবদের সাথে তার দহরম মহরম ছিল, প্রচণ্ড দাপট ছিল। লোকজনকে নানা কারণে তটস্থ করে রাখতেন। তবে শেষ বয়সে লোকটি হঠাৎ পাল্টে যান, সকলের ধারণা কোনো এক ব্যাধির কারণে তিনি খুব কাহিল হয়ে যান। তারপর থেকে জমিদারি কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তমিজুদ্দিন কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তিনিও একসময়ে এ স্থান ত্যাগ করেন–যেমনটা তিনি আমাকে বলছিলেন। আলাউদ্দিন সরকার তার ব্যাধি সারাতে নানা জায়গায় চিকিৎসা নেন, ভারতে, কাবুলে এমনকি ইয়োরোপেও। কিন্তু কেউই তার রোগ সারাতে সমর্থ হয় না। পরবর্তীতে এক হেকিমের চিকিৎসায় তিনি কিছুটা আরাম পান। মৃত্যুর বছর দশেক আগে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার মতো রোগের রোগীদের জন্য তিনি কিছু করবেন, সে কারণেই এই নিবার্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তার ব্যাধি অত্যন্ত দুর্লভ হওয়ায় আশ্রমে রোগী পাচ্ছিলেন না, পরে সিদ্ধান্ত

নেন যেসব ব্যাধিতে মানুষ সমাজচ্যুত হয়, সেসব ব্যাধির যে কোনো রোগীই এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারবে। আশ্রমবাসীদের সমস্ত খরচ তিনিই বহন করতেন।

এতটুকু আমি জেনেছিলাম এখানে আসার আগেই; নিবার্ণ আশ্রম নিয়ে বহু পুরোনো পত্রিকার কাটিং থেকে। এখনো এই আশ্রম টিকে আছে সেটা হয়তো অনেকেই জানে না। এখানকার ম্যানেজার হাফিজকে জিজ্ঞেস করলাম, এই জায়গার খোঁজ রোগীরা পায় কীভাবে? তিনি জানালেন, প্রতিবছর দুইবার তার এক দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। সে বিজ্ঞাপনে জানানো হয় কোন কোন রোগী এই আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।

আমিও একই ভাবে এখানে ডাক্তার প্রয়োজন সে বিজ্ঞাপন পেয়েছিলাম, ওই দৈনিকেই। তবে এটাও ঠিক আমি এই বিজ্ঞাপন চাকরি খুঁজতে গিয়ে পাইনি। *পেয়েছি এই আশ্রমের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়েই।*

কয়েকমাস আগে আমার গোলাপগঞ্জে যাওয়া পরে। সিলেটে জকিগঞ্জে একটা ক্লিনিকে কিছুদিন কাজ করতে গিয়েছিলাম। ফেরার দিন গোলাপগঞ্জ পথে পড়ে, সেখানে নেমেছিলাম দুপুরে খাওয়ার জন্য। হঠাৎ মনে পড়লো সুজনের কথা। সুজন আমাকে দেখিয়ে গেছিলো আরো বছরখানেক আগে। ওর এখন কী অবস্থা সেটা জানার খুব আগ্রহ হচ্ছিলো। ঠিকানাটা আমার ডায়েরিতেই ছিল।

অনেক ঝামেলা করে ওর বাড়ি খুঁজে বের করি। বাড়িতে ওর বৃদ্ধ বাবা মাকে পেলাম। সুজনের খোঁজে এসেছি জেনে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। জানালেন আজ ছয়-সাত মাস হচ্ছে এক আশ্রমের লোকরা এসে সুজনকে নিয়ে গেছে। ওর নাকি আর কোনো চিকিৎসার সুযোগ নেই। শুধুমাত্র ওই আশ্রমেই কিছুটা শান্তি পেতে পারে যতদিন বেঁচে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সুজন নিজ থেকেই যেতে চেয়েছিল?

হ্যাঁ, ওই ওদের সাথে যোগাযোগ করেছিল।

আপনারা আর খোঁজ নেননি?

বৃদ্ধ চোখের পানি মুছে বললেন, তাইনেরা একটা ঠিকানা দিয়ে গেছলা, ওই ঠিকানাত আমার একটা ভাইস্তা পাঠাইছিলাম খোঁজার লাগি। ওখানো যাওয়ার বাদে তাইনরা জানায় সুজন মরি গেছে। বাদে তারা নিয়ম অনুযায়ী দাহ করিলিছে। তারার আশ্রমে কেউ মরি গেলে ওখটাই নিয়ম।

আপনাদের জানায়নি মারা যাওয়ার পর?

না, আমার পোয়ার লাশটাও আমরা দেখতাম ফারছি না।

শুনে বেশ মর্মাহত হলাম। এটা কেমন কথা! এবং মনে হলো এখানে কোনো কিন্তু আছে!

ফিরে আসার মুখে একটা ছেলের সাথে দেখা হলো। জানলাম এই ছেলেটিই সুজনের খোঁজে গিয়েছিল। সুজনের কাজিন। নাম চিন্ময়। বয়স বাইশ-তেইশ হবে। সিলেটের এমসি কলেজে অনার্সে পড়ছে।

আমাকে জানাল, ওকে আশ্রমের ভিতরে ঢুকতেও দেয়া হয়নি। গেট থেকেই বিদায় দিয়ে দিয়েছিলো।

তোমরা পুলিশের কাছে যাওনি?

আমি ভাবছিলাম যাব, কিন্তু কাকা-কাকি রাজি হলো না। তারাও বুঝে গেছিলো সুজনদা আর বাঁচবে না। এখান থেকে যখন নিয়ে যায় তখনই দাদা চলতে ফিরতে পারতো না। ডাক্তাররাও বলে দিছিলো ভালো হবে না। আর তাছাড়া, কাকিমাদের ঘরে আমি ওই আশ্রমের একটা চুক্তিপত্র পাই, ওখানে এই কথা আছে যে আশ্রমে থাকাকালীন মারা গেলে তারা ওখানেই সৎকারকার্য করবে।

শুনে বেশ অবাক হলাম। আমি ছেলেটি থেকে আশ্রমের ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলাম। তারপর কিছুদিন ঘাঁটাঘাটি করি। এবং সেটা করতে গিয়ে দেখি ডাক্তারের খোঁজে একটা সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনও আছে। তমিজুদ্দিন সরকারকে নিয়েও কিছু চমকপ্রদ তথ্য পাই।

তমিজুদ্দিন যৌবনে বাড়ি থেকে পালিয়ে কিছুদিন প্যারিস ছিলেন। তার শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ ছিল। প্যারিসে তার সে আগ্রহ প্রস্ফুটিত হয়, তিনি চিত্রকর হিসেবে কিছুটা নামও করেন। তবে সেসব ছাড়তেও তার সময় লাগেনি। একসময় সব ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন, এবং ধর্মকর্মে মনোযোগী হন। ধারণা করা হয়, তিনি তার অধিকাংশ কাজ পরে নষ্ট করে ফেলেন।

***

নিবার্ণ আশ্রমে আমার মাসখানেক কেটে গেল।

ইতোমধ্যে আমি সব রোগীরই আদ্যোপ্রান্ত জেনে গেছি। এদের সবারই আসলে এমন সব ব্যাধি যা ভালো হবার নয়, এই আশ্রমের উদ্দেশ্যও এটা নয় তাদের সারানো, বরঞ্চ তাদের অবস্থা গ্রহণ করার জন্যই যেন এত আয়োজন। সে হিসেবে আশ্রমটি কিছুটা সার্থক, এখানকার অধিবাসীরা কেউই তাদের অবস্থা নিয়ে এখন মনক্ষুন্ন–সেটা বলার উপায় নেই।

দাওয়াখানাতেই পরে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। আমিও তাতে স্বস্তি পেয়েছি। পুরোনো বাড়িটাতে আমার এক সপ্তাহ ভীষণ অস্বস্তিতে

কেটেছে। একফাঁকে সরকার সাহেবকে বলেছিলাম, জানালা দিয়ে আমি এক বিচিত্র আওয়াজ পেয়েছিলাম রাতে। শুনে উনি উৎসুক হয়ে শুনলেন, যেন বেশ অবাক হয়েছেন। পরে খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, বুঝেছি, বানরের কাজ ডাক্তার সাব। এই এলাকার বন-বাদাড়ে বানর আছে। রাত বিরাতে হয়তো আসছিলো আপনার জানালায়।

সরকার সাহেব একসময় চিত্রকর ছিলেন তার কোনো নমুনা কোথাও দেখিনি। উনি হয়তো আসলেই ওনার সব কাজ নষ্ট করে ফেলেছেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে কেয়ার টেকার হাফিজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তমিজুদ্দিন সাহেব যে বড়ো একজন আর্টিস্ট ছিলেন, এটা কি আপনারা জানেন?

হাফিক চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, একটা ঘরে কিছু পেইন্টিং, ভাস্কর্য আছে। কিন্তু তাকে কোনো দিন কিছু করতে দেখিনি। ওই ঘরটাও তালাবন্ধ থাকে।

আমার খুব আগ্রহ হলো পেইন্টিংগুলো দেখার, কিন্তু তালাবদ্ধ জেনে দমে গেলাম। তমিজুদ্দিন হয়তো তার জীবনের এই অংশটা মুছে ফেলতে চেয়েছেন।

একমাস পার হয়ে যাওয়ার পরও আমি সুজন সম্পর্কে তেমন কিছু জানতে পারলাম না। ছেলেটা এখানে যে এসেছিল তার কোনো নমুনাও চোখে পড়লো না। আশ্রমের অধিবাসীদের জন্য একটা খাতা রয়েছে, সেখানেও সুজনের কোনো নাম দেখলাম না। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পাচ্ছিলাম না। কারণ আমি যে সূজনকে খুঁজতে এখানে এসেছি সেটা জানাজানি হোক তা কোনোভাবেই চাচ্ছিলাম না।

তবে সুজনের খোঁজ পেলাম হঠাৎ করেই। সুজনের মতো আরেকটি রোগী আশ্রমে আসার পর।

৫.

নতুন রোগীর নাম ফরিদ। বয়স বিশের কাছাকাছি। আরেকটি ফাইব্রোডিসপ্লেসিয়া অসিফিকানস প্রগ্রেসিভা রোগী। ছেলেটির কোমড়ের নিচ থেকে শক্ত হয়ে গেছে। পায়ের মাংশপেশী এত শক্ত হয়ে গেছে যে হাঁটতেই পারছে না। শরীরের অন্যান্য জায়গাতেও কোথাও কোথাও অসিফিকেশন হয়ে গেছে, অর্থাৎ জমে হাড়ের মতো হয়ে গেছে।

তমিজুদ্দিন সাহেব কোনো এক কাজে ঢাকা গিয়েছিলেন। রোগী আসার সংবাদে যাত্রা সংক্ষিপ্ত করে চলে এসেছেন। তার চোখ মুখ বেশ উজ্জ্বল মনে

হলো। আশ্রমের কর্মচারীরাও উত্তেজিত। সরকার সাহেব ফরিদের জন্য তাড়াতাড়ি রুম প্রস্তুত করতে বললেন। কিন্তু কিছুটা বিস্মিত হলাম যখন আবিষ্কার করলাম ফরিদের থাকার ব্যবস্থা ওরা করলো আরেকটি ভবনে, ভবনটি দাওয়াখানা থেকে বেশ দূরে, কাচারিঘর ভবনের পাশে আরেকটি দোতলা বিল্ডিংয়ে। ভবনটিতে এখন পর্যন্ত আমি একবারও যাইনি। তাই ওটাও যে রোগীদের একটা থাকার স্থান সেটা আমার জানা ছিল না।

এর কারণ জিজ্ঞেস করতে তমিজুদ্দিন যে জবাব দিলেন সেটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

উনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ডাক্তার সাব, এটা হলো সেই ব্যাধি যেটাতে আমার পিতা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি তাদের জন্যই এ আশ্রম তৈরি করেছেন। তাই এই রোগীদের আমরা একটু আলাদা ভাবে দেখি। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও আলাদা। চিকিৎসাও আলাদা।

কী চিকিৎসা?

সেইটা সময় মতো জানতে পারবেন। তবে আপনার অ্যালোপ্যাথিতে তো এর কোনো চিকিৎসা নাই, সঠিক বললাম না?

জ্বি, এর ভালো কোনো চিকিৎসা নেই।

আমার কথায় যেন সরকার সাহেব সন্তুষ্ট হলেন, কিছুটা উপহাসের হাসিও হাসলেন মনে হলো।

নির্দিষ্ট ভবনটির নিচতলার একটি কক্ষে ফরিদকে রাখা হলো। আবিষ্কার করলাম, সেখানে বেশ কিছু আধুনিক হাসপাতালের সরঞ্জাম আছে। অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, একটি ইমার্জেন্সি রুমের মতো আছে। ফাইব্রোডিসপ্লেসিয়ার রোগী না থাকলে এগুলো বেকার পড়ে থাকে ভাবতেই খারাপ লাগলো। এক ধরনের অপচয় মনে হলো, তবে সেটা আর মুখ ফুটে বললাম না। ফরিদের রুমটাও দাওয়াখানার রুমগুলো থেকে ভালো মনে হলো। নিচতলায় তিনটি রুম, আর দোতলায় দুটি। তবে দোতলা সিড়ি তালাবদ্ধ। সরকার সাহেব বললেন, উপরে তার একটা অফিস কক্ষ আছে আর একটা স্টোর রুম।

এখন থেকে প্রতিদিন এক থেকে দুইবার আমার এখানে এসে এই রোগীর খোঁজখবরও নিতে হবে। তবে আমার কাছে এ রোগের কোনো চিকিৎসা না থাকলেও আশ্রমের নাকি একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে এসব রোগীর জন্য, সেটা কয়েকদিন পর শুরু হবে। সেটা কী হতে পারে তা আমি ধারণা করতে পারলাম না, তাই আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

তিনদিনের মাথায় এক সন্ধ্যায় আমি ফলোআপ করতে গিয়েছি। ফরিদের শরীর বেশ দুর্বল ছিল, প্রেশার কম ছিল। আগেরদিন থেকে শিরাপথে স্যালাইন দিচ্ছিলাম। ফলোআপে গিয়ে ভাইটাল মোটামুটি ভালো পেলাম, তবে স্যালাইনটা আরো বারো ঘণ্টা কন্টিনিউ করবো সিদ্ধান্ত নিলাম। মাঝখানে এক মেডিকেল কলেজের বন্ধু ফোন করলো একটা কেসের ব্যাপারে, ওর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম ফরিদের রুমে বসেই। বেড়োতে বেড়োতে একটু দেরি হয়ে গেল। ঘড়িতে দেখি সন্ধ্যা সাতটা।

ভবন থেকে বেড়ুতে যাব দেখলাম উপরে ওঠার সিঁড়ির তালা খোলা, তারমানে সরকার সাহেব হয়তো উপরেই আছেন। আমি যখন ঢুকছিলাম তখন তালাবদ্ধ ছিল। কোনো এক ফাঁকে হয়তো উনি এসেছেন।

ভাবলাম তার সাথে দেখা করে যাই। রোগীর আপডেটটাও দিয়ে যাই। কিন্তু উপরে উঠে উপরের দুটি রুমই বন্ধ পেলাম। সরকার সাহেব হয়তো এসে চলে গেছেন। সিঁড়ির দুপাশে দুটি রুম। যে-কোনো একটা স্টোর রুম হবে, অন্যটি অফিস। কিন্তু ভিতর থেকে আলো নিভানো থাকায় এবং দরজার উপরে কোনো নামফলক না থাকায় আন্দাজ করতে পারলাম না।

ফিরতে যাব, এমন সময় এক রুম থেকে মৃদু একটা শব্দ পেলাম। যেন ক্ষীণ গলায় কেউ কথা বলছে। তারপরই যন্ত্রণাক্লিষ্ট এক গোঙানির আওয়াজ।

এরপর সরকার সাহেবের গলা স্পষ্ট শুনলাম, আর একটু বাপ, আরেকটু সহ্য কর। ক'দিন বাদেই তুই নিবার্ণ লাভ করবি।

ব্যাপারটা খুব একটা ভালো দেখায় না, তারপরও আমি ভীষণ আগ্রহে দরজার পাল্লাটা বাইরে থেকে টেনে একটু ফাঁক করে ভিতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলাম। তাতে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমি বলা চলে জমে গেলাম।

ভিতরে একটা কক্ষে পাশাপাশি দুটি বেড, পেশেন্ট বেড। তার একটিতে একটি শীর্ণকায় যুবক বসে আছে। বসার ভঙ্গি অস্বাভাবিক। মনে হচ্ছে বেল্ট দিয়ে বিছানার পেছনের খাড়া অংশের সাথে বাঁধা। একটা স্যালাইন ব্যাগ ঝুলছে। আর ওর সারা হাত-পা মুখে অসংখ্য সুই ফুঁটানো। এবং ছেলেটাকে আমি চিনতে পারলাম–সুজন! সরকার সাহেব ওর গায়ে লাগানো সেসব সুই পরীক্ষা করে দেখছেন মনে হলো।

আমি চমকে ওঠায় দরজার পাল্লাতে টান পড়লো। তাতে একটা ক্যাচক্যাচ আওয়াজ তৈরি হলো। বিদ্যুৎবেগে সরকার সাহেব দরজার দিকে চাইলেন, এবং আমার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল।

তার সে চোখের দৃষ্টি ভোলা কষ্টকর হবে, কী এক হিংস্র চাহনি!

৬.

সরকার সাহেব দরজার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ নিজের চাহনি পাল্টে ফেললেন, আরে ডাক্তার সাব, আপনি আছেন? আমি তো ভাবছি আপনি চেকআপ করে চলে গেছেন।

আমি মিনমিন করে বললাম, এই তো যাচ্ছিলাম, পরে সিঁড়ির দরজা খোলা দেখে ভাবলাম আপনার সাথে দেখা করে যাই।

হেহ হে, ভালো করছেন, আসেন আসেন। আপনাকে তো আজ না হয় কাল বিস্তারিত বলতেই হতো।

তারপর সুজনের দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে বলল, এই রোগী আমার এখানে আছে কিছুদিন ধরে। তার চিকিৎসা চলছে।

সুজনও মনে হলো আমাকে দেখে চিনতে পেরেছে, ওর ক্ষীণ গলা দিয়ে যথাসম্ভব চেঁচিয়ে বলল, ডাক্তার সাহেব, আমাকে বাঁচান। এ এক পিশাচ!

তাতে সরকার সাহেবের প্রতিক্রিয়া হলো চমকে ওঠার মতো।

ওর সাথে আপনার ইতোমধ্যে দেখা হয়েছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে এখানে না। সে আমার পুরোনো রোগী।

বলেন কী! কী অদ্ভুত ব্যাপার। শোনেন, ওর কথায় বিভ্রান্ত হইয়েন না, এখন ওর চিকিৎসা চলতেছে, তাই কিছুটা যন্ত্রণা পাইতেছে এজন্য আমাকে সহ্য করতে পারছে না, ক'দিন পর ঠিক হয়ে যাবে।

সুজন আবার চেঁচালো, আমাকে হয় বাঁচান না হলে মেরে ফেলেন। এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

তাতে সরকার সাহেব এক কঠিন দৃষ্টিতে সুজনের দিকে তাকাল। তাতে সুজন ভয়ে মিইয়ে গেল।

এই আকুপাঙচারই চিকিৎসা? আমি একটু কঠিন গলায় বললাম।

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। সুইগুলা চীন থেকে আনানো। আর তার সাথে কিছু ভেষজ ঔষধ আছে।

আমি বললাম, এ রোগীর যে রোগ হয়েছে তাতে আকুপাঙচার মারাত্মক খারাপ পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। ফাইব্রোডিসপ্লেসিয়ার রোগীর শরীরে সামান্য আঘাত লাগলেই তার সে অংশ আরো দ্রুত শক্ত হয়ে যায়।

আমার কথা সরকার সাহেব জোর করে থামিয়ে দিলেন, আহা, করেন কী, আপনাদের ওই অ্যালোপ্যাথি বিদ্যা শুনিয়ে তো রোগী বেচারার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিবেন।

আমি বললাম, আপনি কি এভাবে আগে এ রোগ সারিয়েছেন?

রোগী সারানো বলতে কী বোঝেন আপনি? উনি উল্টা প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমার মনে হলো উনি কথার খেলা খেলছেন।

সারানো মানে এই রোগের যে সমস্যা, মাংসপেশি হাড় হতে থাকে সেটা বন্ধ করে দেয়া। আমি জোর গলায় বললাম।

সরকার সাহেব এবার আমার হাত ধরে টেনে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, আসেন রোগীর সামনে এই আলাপ না করি। তবে ডাক্তার সাব, রোগ সারানো নিয়ে আপনাদের এই ধারণা খুব সোজাসাপ্টা। এমনকি কোনটা রোগ, কোনটা রোগ না এটাও আমরা অনেক সময় ঠিক বুঝি না।

তিনি ঠিক কী বলতে চান সেটা স্বভাবতই আমার বোধগম্য হলো না।

বললেন, রোগতত্ত্বের ইতিহাস তো আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। অনেক সময়ই আমরা এমন সব জিনিসকে রোগ বলতাম যেগুলো পরে জানতে পেরেছি রোগ না, আছে না এমন?

আমি একটু ভ্রু কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করে স্বীকার করলাম, হ্যাঁ, তা আছে।

ছোটোবেলায় আমার বাপজান ভাবতো আমি যে বামহাতি এটা আমার রোগ।

আমি বললাম, সেটা রোগ না হতে পারে, কিন্তু সুজন বা ফরিদের যে কন্ডিশন এটা অবশ্যই রোগ। এর কারণে ওরা স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে পারছে না।

সরকার সাহেব বললেন, বামহাতি হওয়ার কারণে আমিও অনেক কাজ ঠিকঠাক করতে পারতাম না, আমাদের আসবাব পত্র থেকে শুরু করে অনেক কিছু ডানহাতিদের জন্য বানানো। তবে ভাগ্য ভালো, বামহাতিদের সংখ্যা পৃথিবীতে অনেক, এমন যদি হইতো, এককোটি মানুষে একজন বামহাতি তাহলে দেখতেন এইটার জন্য আমরা ঔষধ খাইতাম।

আমি এই উন্মাদের সাথে আর তর্কে গেলাম না। বললাম, হ্যাঁ, সেটা সত্যি। কিন্তু ফাইব্রোডিসপ্লেসিয়ার রোগীরা খুব বেশিদিন বাঁচেও না। এটাকে আপনি রোগ বলবেন না?

সবারই একই রকম দীর্ঘ সময় বাঁচতে হবে এমন কোনো কথা কি আছে?

তা নেই, কিন্তু এই ব্যাধিটা না থাকলে তারা বেশি বাঁচতো।

উহুঁ, ডাক্তার সাব। আপনি বোঝার চেষ্টা করেন, এক এক মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এক এক রকম। সেই উদ্দেশ্যের সাথে তাদের আয়ুও বদলায়।

ওদের উদ্দেশ্য কী? ধীরে ধীরে হাড় হয়ে যাওয়া? আমি কিছুটা ক্রোধ প্রকাশ করে বললাম।

আমার সে কথার জবাব না দিয়ে সরকার সাহেব আমাকে দোতলার অন্য রুমটাতে নিয়ে গেলেন। যে রুমটাকে আমি ভেবেছিলাম তার অফিস কক্ষ। কিন্তু ঢুকতে মনে হলো, এটা মোটেও অফিসের কাজ করার জায়গা না। এটা একটা আর্ট স্টুডিও।

দেয়াল থেকে ঝুলছে বড়ো বড়ো বেশ কিছু পেইন্টিং। একপাশে কয়েকটা ইজেল। রুমটা পরিস্কার, তারমানে সরকার সাহেব তার শিল্পকর্ম ছেড়ে দেননি। তিনি এখানে এখনও সময় দেন।

ডাক্তার সাব, একসময়ে পেইন্টিংয়ে খুব ঝোঁক ছিল। তখনকার সময়ের কাজ এগুলা। এখন আর এসব করা হয় না। এখন খোদাতালা যে আর্ট চারপাশে ছড়ায় রাখছে তারই যত্ন নেই। নিজ থেকে আর কী বানাবো?

রুমের একপাশে দেখলাম কিছু ভাস্কর্য, নারী পুরুষ শিশু, নানা ভঙিমায়। তার হাতের কাজ যে ভালো ছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

আমাকে ভাস্কর্যগুলোর দিকে তাকাতে দেখে তার মুখে হাসি ফুটলো। বলল, এগুলো আমার অল্প কিছু কাজ। অধিকাংশ ভালো কাজই তো বিদেশে রয়ে গেল। হয়তো অযত্নে পড়ে আছে কারো বাড়ির ড্রয়িংরুমে।

তারপর রুমের আরেকটা দরজা খুলে বললেন, এদিকে আসেন। এই রুমে কিছু কাজ আছে দেখেন।

রুমটাতে অদ্ভুত এক অচেনা গন্ধ। গন্ধটা সহ্য করা যাচ্ছে তবে মোটাদাগে কটু গন্ধ। কী আছে এখানে?

দেখলাম বেশ কিছু মানবমূর্তি। তবে আগের গুলোর মতো সুন্দর না, কেমন অসম্পূর্ণ, কিছুটা বীভৎস।

এগুলো আপনার করা?

উঁহু, এত নিখুঁত জিনিস করার হাত আমার নাই ডাক্তারসাব। এরা খোদাতালার সৃষ্টি।

মানে?

এই যে কোনায় যে মানুষটা দেখতেছেন, উনি আমার বাপ!

শুনে আমি শিউরে উঠলাম। কী বলছে। এগুলো মানব কঙ্কাল?

কঙ্কাল বলা ভুল হবে। দেখেন হাত পা, মুখে মাংসও বোঝা যাচ্ছে। কারণ তার মাংসপেশি অনেকগুলোই হাড়ে পরিবর্তন হয়ে গেছিলো।

তারপরে এদিকে দেখেন... সরকার সাহেব চোখ মুখ উজ্জ্বল করে আরেকদিকে নিয়ে গেলেন আমাকে। পুরো রুমটাতে সাত কি আটটা মানব কঙ্কাল রয়েছে।

তিনি যে কঙ্কালটা দেখালেন, সেটিকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই এটা যে মানবকঙ্কাল, পুরো শরীরে এত বেশি হাড় দিয়ে ঢেকে আছে যে মনে হয় কোনো বেখেয়ালি ভাস্কর কাজটা করেছে।

আমার গা গুলিয়ে আসলো। স্বাভাবিক ভাবে শরীরের এত বেশি অংশ হাড় হওয়া সম্ভব না।

সরকার সাহেব গর্বিত আর লোভী গলায় বললেন, ডাক্তার সাহেব, এটাও একটা শিল্প। আমার বাপ ব্যাপারটা প্রথমে ধরতে পেরেছিলো। তার হাতেই প্রথম একটা দুইটা ভাস্কর্য হয়, আর আমি এই দায়িত্ব নেয়ার পর আরো নিখুঁত করি। আমি বুঝতে পারি, এই রোগীদের প্রাথমিক স্টেজে যদি আমরা আমাদের হাতের কাছে আনতে পারি, তাহলে ওর শরীরের সবগুলো মাংশপেশী হাড় বানিয়ে ফেলা সম্ভব।

শুনে আমি আঁতকে উঠি। এই বুড়ো বদ্ধ উন্মাদ।

ওই আকুপাংচারের মাধ্যমে?

ঠিক ধরেছেন। এই রোগীদের শরীরের যে যে অংশে সুক্ষ্ম আঘাত করা হয় সেই অংশটি শক্ত হয়ে যায়, তারপরই হাড় হতে শুরু করে। এমনকি চোখও, এই যে দেখেন এই কংকালটায়। সমস্যা হলো, এটা যদি ঠিকভাবে হিসাব করে না করা হয়, তাহলে আগে আগে রোগীগুলো মারা যায়। আর মরে গেলেই তাদের শরীরের এই ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা যেটা করি, অক্সিজেন স্যালাইন ইত্যাদি দিয়ে দীর্ঘদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখি। পরে হিসাব করে শরীরের সব স্থানে সুই দিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু করি।

এটা তাদের জন্য যে অমানুষিক যন্ত্রণাকর সেটা আপনার মনে হয় না?

ডাক্তার সাব, বড়ো উদ্দেশ্য পূরণ করতে কখনো ছোটো ছোটো যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। মুক্তা বানানোর জন্য ঝিনুকের যেমন যন্ত্রণা হয়, তেমনি। খোদাতালার দুনিয়াটাই এমন।

আমি বললাম, এসব রোগীর জীবনের কী উদ্দেশ্য সেটা ঠিক করে দেয়ার লোক আপনি, সেটা কে বলেছে আপনাকে?

আমি বিশ্বাস করি, এই দায়িত্ব দিয়েই আমাকে পাঠানো হইছে দুনিয়ায়। আর রোগী যারা তারা হয়তো বুঝতে পারছে না। কিন্তু তাদেরও এই অবস্থা হয়েছে যাতে তারা একটা শিল্পকর্মে পরিণত হতে পারে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। এই উন্মাদের সাথে কথা বলে কোনো লাভ হবে না সেটা স্পষ্ট। বরঞ্চ বিপদে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কিন্তু আমি যে ইতোমধ্যে বিপদে পড়েছি তা তার পরের কথায় বুঝলাম।

তিনি চোখ নাচিয়ে বললেন, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনি সুজনরে খুঁজতে এখানে এসেছেন? কথা কি সত্য?

আমি সে কথার জবাব দিলাম না।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, সুজন এরইমধ্যে নব্বইভাগ শক্ত হয়ে গেছে, ও হবে আমার সবচেয়ে নিখুঁত কাজ। ওর ব্যাপারে কোনো খবরদারি করতে যাবেন না।

কথাটায় আমার আত্মসম্মানে লাগলো। বললাম, সুজনের বাপ-মাকে আপনি বলেছেন ও মারা গেছে, আপনি ওর বাপ-মা আত্মীয় স্বজনের অনুমতি ছাড়া তার সাথে যা ইচ্ছা করছেন, অসহায় ছেলেটাকে নরক যন্ত্রণা দিচ্ছেন।

সুজন ওই শর্ত মেনেই এখানে আসছে।

উঁহু, আমি নিশ্চিত সুজন এটা জানতো না যে আপনি ওর উপর এসব করবেন।

এরমধ্যে পেছনে একটা ছায়ামূর্তি হাজির হয়েছে টের পেলাম। ঘাড় ঘুড়াতে দেখি হাফিজ। নিশ্চয়ই কোনো এক ফাঁকে হাফিজকে এখানে ডেকেছেন তিনি। সরকার সাহেব কোনো একটা ইশারা করলেন, সাথে সাথে হাফিজ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরলো।

ছেলেটার প্রচণ্ড শক্তি। আমি একদমই নড়তে চড়তে পারলাম না।

ওরা একটা চেয়ারের সাথে আমাকে বেঁধে ফেলল। বেঁধে পাশের রুমে নিয়ে গেল। যেখানে সুজন রয়েছে।

সুজনও মনে হলো বুঝে ফেলেছে আমাকে যে ধরে ফেলেছে।

আমাকে এ অবস্থায় দেখে অনুনয় করে বলল, ডাক্তার সাহেবকে ছেড়ে দেন সরকার সাব।

সরকার সাহেব চিন্তিত মুখে বললেন, ছেড়ে দিলে ডাক্তার সাব আবার কী সর্বনাশ করে সেটা ভাবছিরে বাপ। তোর নির্বাণ করতে একটা বাঁধা হইয়া দাঁড়াবে।

আমাকে নিয়ে কী করতে চান? আমি ক্রোধে ফুঁসে বললাম।

সেইটা এখনো জানি না ডাক্তার সাব, আপনাকে ভালো লাগছিল, কিছু করতে তো খারাপ লাগবো। আর আমি খুন-খারাবির মতো খারাপ কাজ করিও না। তবে হ্যাঁ, আজীবন আটকে রাখতে পারবো, কেউ খোঁজ নিতে এসে পাবে না। তারপর হাফিজের দিকে ফিরে বললেন, হাফিজ যাও, এমন একটা রুম রেডি করো।

হাফিজ বেড়োতে যাবে এমন সময় দরজায় আরেকটি মুখ দেখা গেল।

ফরিদ।

ফরিদের হাতে একটা শক্ত পোক্ত রড জাতীয় কিছু। যে ছেলেটি হুইলচেয়ারে ছিল সে দোতলায় হেঁটে উঠেছে এবং এমন মারমুখী হয়ে, সেটা বিশ্বাস করা স্বভাবতই সরকার সাহেব ও হাফিজের জন্য ছিল কঠিন।

ফরিদ ওদের চমক ভাঙার আগে প্রথমে হাফিজের উপর আঘাত হানলো। মাথার পেছনে ওর নিখুঁত এক আঘাতেই হাফিজ মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

সরকার সাহেবকে মারতে আমি মানা করলাম।

ও বলল, ইতোমধ্যে আমার বন্ধুদের জানিয়েছি সুজনদা এখানেই আছে। তারা রওনা হয়ে গেছে। আর কোনো চালাকির চেষ্টা করবেন না কাউকে ডেকে এনে।

হাত পায়ের বাঁধন খোলার পর আমি সরকার সাহেবের মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করলাম, এত দুর্লভ একটা রোগ ছয়মাসের মধ্যে দুটি পেয়ে গেলেন, অবাক হননি?

সরকার সাহেব অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকালেন।

ফরিদ, সুজনের খালাতো ভাই, আসল নাম চিন্ময়। মাসদুয়েক আগে আপনার এখানে এসেছিল সুজনের খোঁজ নিতে। তাকে আপনারা জানিয়েছিলেন সুজন মরে গেছে। পরে আমি জানতে পেরে ওকে বলি, এত তাড়াতাড়ি সুজনের মৃত্যু বরণ করার কথা না। ফাইব্রোডিসপ্লেসিয়ার রোগীরা পয়ত্রিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

তারপরই আমি বিজ্ঞাপন দেখে এখানে আবেদন করি, আর চিন্ময়কে বলি রোগী হিসেবে চলে আসতে। চিন্ময় সন্দেহ এড়াতে নাম ধর্ম এলাকা ইত্যাদি পরিবর্তন করে ফরিদ সাজে।

এত বছর এই রোগ দেখেও ওর পায়ের সস্তা প্যারিস প্লাস্টারের প্রলেপ চিনতে পারলেন না।

তমিজুদ্দিন সরকার আর কিছু বলেনি।

তার সবচেয়ে নিখুঁত ভাস্কর্য বানানোর সুযোগ যে হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেই দুঃসংবাদে তিনি পাথর হয়ে রইলেন।

মেরিনা



বইঘর/মহাকাল

১.

একজন রোগী যতটা না তার চিকিৎসা চায়, অনেক সময়ই তার চেয়ে বেশি করে চায় জানতে–তার আসলে কী হয়েছে। একই ব্যাধির একাধিক দাওয়াই থাকতে পারে, নানা ভাবে চলতে পারে তার চিকিৎসা, ট্রেডিশনাল মেডিসিন, সার্জারি, অ্যায়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি কত ধারার কত পথ রয়েছে। এমনকি কোনো চিকিৎসা না করার সিদ্ধান্তও রোগী নিতে পারেন। কিন্তু তার কী হয়েছে সেই ব্যাধির নাম না জানলে এক অদ্ভুত অসহায়ত্বের মধ্যে মানুষ মাত্রই পড়ে যান।

এই সত্যের হাত ধরে আরেকটি যে সত্য, যেটি আমি নিজ জীবন থেকে শিক্ষা পেয়েছি, সেটা হলো কেউ না চাইলে কোনোক্রমেই তার রোগ নির্ণয় করা উচিত নয়। ডায়াগনসিস তাই কিছুটা অন্তর্বাসের রঙের মতো, যে চাইছে না আপনাকে তা জানাতে, উপযাজক হয়ে সেটা আন্দাজ করতে গেলে একটা অস্বস্তিকর মনোমালিন্য হতে পারে। এবং সেটা কতদূর যেতে পারে তা আজকের ঘটনাটি শুনলে আপনারা ধরতে পারবেন।

কয়েকবছর আগে একটি মেয়ের সাথে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়। মেয়েটি আমার এক বন্ধুর দুঃসম্পর্কের আত্মীয় ছিল। আমার বন্ধুটিই নিজ আগ্রহে মেয়েটির সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। ওর নাম মেরিনা।

মেরিনা খুব চটপটে স্বভাবের মেয়ে, অন্যদিকে আমি যেহেতু ধীরস্থির তাই এটা খুব সম্ভব সম্পর্ক ছিল। মেরিনা আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো। এটা একটা মন্দ দিক ছিল আমার জন্য, যে মানুষের রোগ-ব্যাধি নিয়ে একটু অগ্রসর ধারণা নেই তার সঙ্গে আমি কী বিষয় নিয়ে নৈমত্তিক কথা বলবো সেটা আমায় চিন্তায় ফেলে দিল। কারণ আমার জগৎটাই ব্যাধিময়, ওর বাইরে আমি গল্প করতেও জানি না। আমার চেম্বারে যদি এক ক্রুজফিল্ড ইয়াকব ডিজিজের পেশেন্ট চলে আসে, আর তা যদি উৎসাহ নিয়ে রাতে ডিনার খেতে খেতে রসিয়ে বলতে না পারি জীবনসঙ্গীকে, তাহলে সেটা এক মুশকিলই। এসব সত্ত্বেও আমি এই সম্পর্কে বেশ আগ্রহী ছিলাম, কেননা এই চটপটে মেয়েটাকে আমি ভীষণ পছন্দ করে ফেলেছিলাম অল্পদিনেই।

সব ঠিকঠাক থাকলে আমাদের এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত। সেটা যে হলো না তার পুরো দায়ভার আমার ওই রোগনির্ণয় করার বাতিকের।

ঘটনাটি ঘটেছিল গত বছরের জুলাইতে। হঠাৎ মেরিনার বাবা অসুস্থ হয়ে যান। ওর বাবা খালেকুজ্জামান ছিলেন ঢাকার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, খুব কড়া মেজাজের লোক, ইতিহাস বা এধরনের কোনো এক সাবজেক্ট পড়াতেন।

হঠাৎ একদিন উনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন ক্লাস নেয়ার সময়। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠালো।

মেরিনা আমাকে জানানোর পর আমি ঢাকা মেডিকেলে ওই সময় আমার পরিচিতদের সাথে কথা বলে ভালো কেবিনের ব্যবস্থা করে দিলাম।

প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হলো স্ট্রোক। তার ম্যানেজমেন্ট শুরু হলো। তবে সিটি স্ক্যানে কোনো কিছুর আলামত পাওয়া গেল না। সেসময় আমি নরসিংদীতে একটা ক্লিনিকে কাজ করি। মেরিনার বাবার এই অবস্থায় কিছুটা সাপোর্ট দেয়ার জন্য কয়েকদিন ছুটি নিয়ে ঢাকা চলে এলাম।

ওখানকার রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার আনিস ছিল আমার পরিচিত। ওর সাথে কথা বলে বুঝলাম, ভদ্রলোকের সঠিক কোনো ডায়াগনসিস এখনো হয়নি। আপাতত সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট বা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

আনিসের সাথে আলাপের এক পর্যায়ে ও একটা অদ্ভুত তথ্য দিল, খালেকুজ্জামান এর হাত পায়ে মাঝেমধ্যেই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার হচ্ছে, খিঁচুনির মতো তবে খিঁচুনি না, কিছুটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুভমেন্ট।

ইলেকট্রোলাইট ঠিক আছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করলাম, আনিস তাতে আমাকে রিপোর্ট দেখালো, দেখলাম সবই স্বাভাবিক মাত্রায় রয়েছে।

আমি আসায় মেরিনা স্বস্তি পেল। ও গত দুইদিন ধরে হাসপাতালে, এখানে থাকার মতো কেউ নেই। ওর মা হাসপাতালে থাকতে চান না, আর আত্মীয় স্বজনও ঢাকায় কেউ নেই এখন।

আমাকে বলল, তুমি আজকে রাতটা থাকতে পারবে না বাবার সাথে? আমি সকালেই চলে আসবো।

আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, তুমি যাও, তাড়াহুড়ার দরকার নেই, ভালো মতো ঘুম দিয়ে আসো। আমি তো হাসপাতালেরই মানুষ, আমার কোনো সমস্যা হবে না।

মেরিনা চলে যাওয়ার পর আমি কেবিনের এক্সট্রা বেডটাতে শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিলাম। খালেকুজ্জামানকে সিডেটিভ দেয়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ঘুমাচ্ছেন।

এক ফাঁকে আনিস এসে বিদায় নিল। নাইট ডিউটিতে যে এসেছে তার নাম্বার দিয়ে চলে গেল। যদিও মনে হয় না, রাতে কাউকে আর প্রয়োজন হবে। আর হলে তো আমি আছিই।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এক শব্দে ঘুম ভাঙে। কেবিনে ডিম লাইট জ্বালানো। মনে হলো খালেকুজ্জামান সাহেব কোনো শব্দ করেছেন। আমি চেক করার জন্য বালিশের পাশ থেকে চশমাটা নিয়ে চোখে পড়লাম।

একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখলাম।

দেখি বিছানায় খালেকুজ্জামান দুই পা তুলে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। দেখে বুক ধক করে উঠলো। ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো শ্বাপদ, এক্ষুনি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। অল্প আলোতে চোখের দৃষ্টি ভালো বুঝতে পারলাম না, তবে মনে হলো সেটি স্বাভাবিক না। চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে, সেটা মৃদু আলোর কারণেও মনে হতে পারে।

তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছিলাম, ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে। সাথে মৃদু গরগর আওয়াজ। এমন অবস্থার কোনো রোগী আমি কখনো দেখিনি। গভীর রাতে তিনফুট দূরে এমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গির মানবমূর্তি দেখে আমি কিছুটা শিউরে উঠলাম।

আমি খুব সাবধানে উঠে বসলাম। খালেকুজ্জামান আমাকে লক্ষ করছেন কিনা বুঝতে পারলাম না। তিনি তার মুখ উপরের দিকে তুলে এদিক-ওদিক নাড়ছেন। যেন কিছু খুঁজছেন আশেপাশে।

আমি উঠে বসে বিছানা থেকে নেমে গেলাম। কোনোমতে পায়ে স্যান্ডেল গুঁজে সুইচ বোর্ডের দিকে খুব সন্তর্পণে চলে গেলাম।

আমার মনে হচ্ছে রুমের বাতিগুলো সব জ্বালালে ব্যাপারটা আরো ভালো বোঝা যাবে।

বাতি সবে মাত্র জ্বালিয়েছি, সাথে সাথে যেটা হলো তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। খালেকুজ্জামান লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি ভয়ে দেয়ালের সাথে সিঁটিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে স্পর্শ না করে তার মুখ যতটা সম্ভব আমার মুখের কাছে নিয়ে প্রচণ্ড উচ্চ স্বরে 'হাহ হা, হা হাহা হা হা হাহ হাহা' করে গগনবিদারী এক হাসি দিলেন।

তার এ কাণ্ডে আমি যেন কিছুটা সম্মোহিত হয়ে গেলাম, মনে হলো অশরীরী কোনো অস্তিত্বের সামনে আমি আটকা পড়ে গেছি।

বাইরে একটা হুটোপুটির আওয়াজ শুনলাম। মনে হলো, পুরো ওয়ার্ড এই অট্টহাসি শুনতে পেয়েছে।

২.

খালেকুজ্জামান সাহেবকে পরদিন পরীক্ষানিরীক্ষা করে ধারণা করা হলো তার কোনো এক সাইকোসিস ডেভেলপ করেছে। গতকালের পর থেকে উনি আর স্বাভাবিক হননি। তার শরীর যেন অন্য কারো নিয়ন্ত্রণাধীণ। অট্টহাসির ব্যাপারটা দিনেও একবার হলো।

মেরিনা ভীষণ ভেঙে পড়লো।

ওর বাবাকে ডিসচার্জ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো, নিউরোমেডিসিন এর প্রফেসর আতিক স্যার আমাকে জানালেন, ওনি যে স্টেজে আছেন তাতে এ ডিপার্টমেন্টে রাখা ঠিক হবে না।

উনি যেটা বোঝোনোর চেষ্টা করলেন সেটা হলো, রোগীকে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে যেন আমরা নিয়ে যাই।

আতিক স্যারকে আমি আগে থেকেই চিনতাম, আমার ছাত্রাবস্থায় আমাদের মেডিকেলে জয়েন করেছিলেন লেকচারার হিসেবে।

আমাকে বললেন, আসিফ, রোগীর সব ধরনের টেস্ট করা হয়ে গেছে। সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সমস্ত ল্যাব টেস্ট, কোনো টেস্টেই অস্বাভাবিক কিছু নেই। তারমানে ব্যাপারটা পুরোপুরি মানসিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

মেরিনা কোনো মেন্টাল হেলথ কেয়ারে ওর বাবাকে রাখতে রাজি হলো না। ও আমাকে বলল ওর বাবাকে বাসায় নিয়ে যাবে।

আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এটা কোনো ভালো সমাধান হবে না। তোমার বাবা ভায়োলেন্ট হয়ে গেলে ঝামেলায় পড়ে যাবে!

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ও মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করলো। তারপর ধাতস্থ হয়ে বলল, আসিফ, আব্বু বাঁচবে না।

শুনে আমি বেশ অবাক হলাম।

আরে, কী বলো! ওনার সাময়িক কোনো ঝামেলা হয়েছে। হ্যাঁ, হয়তো তোমাদের ওনাকে নিয়ে বেশ ঝক্কি পোহাতে হবে কিছুদিন, কিন্তু এটা প্রাণঘাতী কিছু না।

মেরিনাকে এ কথা বলে প্রবোধ দেয়া গেল না।

ও বলতেই থাকলো, না না, এটা আমাদের পারিবারিক রোগ। আমার বড়োচাচাও একই ভাবে মারা গেছেন!

কীভাবে?

হঠাৎ করে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর অদ্ভুত আচরণ। এবং তার কয়েকমাসের মধ্যেই মারা যান।

মেরিনার কথা শুনে আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এমন কোনো বংশপরম্পরায় প্রবাহিত জেনেটিক রোগ আছে কিনা সেটা নিয়ে কিছুটা চিন্তা করলাম। খুব বেশি দূর মেলাতে পারলাম না।

মেরিনার ইচ্ছা অনুযায়ী ওর বাবাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। এবং তাকে বাসার একটা ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হলো।

আমি মাঝে মধ্যে যেয়ে দেখে আসতাম। মেরিনার মাকে দেখে মনে হলো, তিনিও মেরিনার মতোই বিশ্বাস করেন, খালেকুজ্জামান সাহেব বাঁচবেন না। মেরিনাকে যেমন স্বান্তনা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম, তেমনি তাকেও দেয়ার চেষ্টা করলাম। বললাম, দেখুন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওনার কোনো মানসিক রোগ হয়েছে। ওনার শরীরে কোনো জীবাণু বাহিত রোগের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সমস্ত ল্যাব টেস্ট নরমাল। ওনার এই মানসিক সমস্যার জন্য চিকিৎসা করাতে হবে এখন।

উনিও মেরিনার মতোই দৃঢ় গলায় বললেন, বাবা, এই রোগ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আমাদের পরিবারের মানুষরা মারা যায়। আমার ছোটোবোনও কয়েকবছর আগে একই ভাবে মারা গেছে।

আমার অবাক হওয়ার মাত্রা আরো বাড়ে।

আপনার ছোটো বোন, আবার বলছেন মেরিনার বড়ো চাচাও একই ভাবে মারা গেছে?

হ্যাঁ।

আমি একটু সংশয়বাদী আচরণ করায় মেরিনা পুরোনো ফাইলপত্র ঘেঁটে কিছু প্রেসক্রিপশন, ল্যাব টেস্ট ইত্যাদি নিয়ে আসলো। ফাইলগুলোর একটি হচ্ছে ওর খালার, অন্যটি ওর বড়ো চাচার।

দুটো ফাইলেই রোগীর যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে তাদের দুজনারই মাংসপেশিতে নিয়ন্ত্রণে সমস্যা ছিল। অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। এবং দুজনাই খুব অল্প সময়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মেরিনার মা জানালেন, তার এক দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ও একইভাবে মারা গেছে গত বছর।

মেরিনাদের পরিবারের আরো একটা অকাল মৃত্যু আছে আমি আগে থেকেই জানতাম। ওর ছোটো এক ভাই ছিল। ছেলেটি এক দূর্ঘটনায় মারা যায় ওদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে, সেসময় ওর ভাইয়ের বয়স ছিল সাত কী আট। মেরিনা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলে, ওর ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে ওর পুরো পরিবার ওলটপালট হয়ে যায়। কেউ আর পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারেনি।

আমি মেরিনার ভাইয়ের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করলাম ওর মা কে। পরে মনে হলো ব্যাপাটা ঠিক হয়নি। মেরিনার মা মনে হলো খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, আমার ছেলে পানিতে ডুবে মারা গেছে। কোনো রোগে না।

আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থায় সেদিন ওদের বাড়ি থেকে বের হলাম। আমি মনে মনে কিছু ডায়াগনসিস ভাবা শুরু করেছিলাম, সে কারণেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছিলাম। উইলসন ডিজিজ এর কথা মাথায় এসেছিলে, যেখানে পরিবারের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে একজনের হলে অন্যদেরও থাকার সম্ভাবনা থাকে, সেটাতেও মস্তিষ্কে তামা জমে রোগী পাগলামি আচরণ করতে পারে।

কিন্তু মেরিনার পরিবারে বাবা ও মা দুই পক্ষের আত্মীয়দের একই রোগ হওয়ার... হিসেব মিলছে না। জেনেটিক কিছু হলে হয় মায়ের দিকের নয়তো বাবার দিকের আত্মীয়দের শুধু হতো।

মনে হচ্ছে কোনো ইনফেকশাস এজেন্ট রয়েছে ওদের পরিবারে। সেটা খুঁজে বের করতে না পারলে ডায়াগনসিসে পৌঁছানো যাবে না।

মেরিনার আত্মীয়রা একই রোগে মারা গেছে সেটা নিশ্চিত হওয়াও যাচ্ছে না। হতে পারে কাকতালীয় ব্যাপার, একই ধরনের রোগে তারা দৈবক্রমে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু আমার এই ধারণাও মিথ্যে হয়ে গেল দুই সপ্তাহ পর।

জানতে পারলাম, মেরিনার বাবা হঠাৎ করেই মারা গেছেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও তিনি অট্টহাসি হাসছিলেন।

৩.

মেরিনা বাবা মারা যাওয়ার মাসখানেক পরে ওদের বাড়িতে একদিন গিয়েছি।

ততদিনে মেরিনা আর ওর মা ধাতস্থ হয়েছে। দুপুরের খাবার খেতে খেতে ওর মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বলছিলেন, আপনার এক দুঃসম্পর্কের আত্মীয় একই রোগে মারা গেছে। উনি কে ছিলেন?

তিনি একটু থেমে ধীরে ধীরে বললেন, মইনুল, আমার চাচাতো বোনের মেয়ের হাজবেন্ড।

আচ্ছা, দুঃসম্পর্কেরই বটে। মনে মনে বললাম, রক্তসম্পর্কীয় না। এখানেও জেনেটিক রোগের কাতারে ফেলার জন্য ভালো প্রমাণ মিলছে না।

আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করলাম, মইনুল সাহেবেরও মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো?

মেরিনা বলল, মইনুল ভাই থাকেন ইংল্যান্ডে। কয়েকবছর পর পর দেশে আসেন। তবে শেষবার উনি দেশে আসার পর এই লক্ষণ দেখা দেয়।

কত দিন আগে শেষবার এসেছিলেন?

তিন বছরের মতো হবে।

আচ্ছা, কী লক্ষণ দেখা দিয়েছিলা?

প্রায় একই রকম। উনিও নাকি প্রচণ্ড হাসতেন। অসুস্থ হওয়ার মাস কয়েকপর মারা গেছেন।

তারমানে এখন পর্যন্ত চারজন পাওয়া যাচ্ছে একই রোগ হয়েছিল। মেরিনার বাবা, বড়ো চাচা, ওর খালা এবং মইনুল সাহেব। বেশ রহস্যময় ব্যাপার।

আচ্ছা, এই চারজন শেষ কবে একসাথে দেখা করেছিল, মানে অন্তত একটা দিন বা দিনের বড়ো একটা অংশ একসাথে ছিল?

আমার প্রশ্নে মেরিনার মা স্মৃতি হাতড়ে বললেন, ওর বাবা, চাচা আর আর আমার বোনের তো প্রায় প্রতি ঈদেই দেখা হত একসময়। গত তিন বছরে হয়নি, তবে তার আগে অনেকবার এমন হয়েছে। তবে মইনুল তো বিদেশ গেল সাত আট বছর হবে। তাই ওকে ধরলে অন্তত দশ বারো বছর আগে।

দশ বারো বছর আগে! মইনুলের সাথে কি প্রায়ই দেখা হত বাকি তিনজনের।

অবশ্যই। মইনুল তো একসময় আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল। ছাত্র অবস্থায়। তখন যতবারই ছুটি ছাটায় যেতাম মইনুল এর সাথে দেখা হত সবার।

সব শুনে আমি মনে মনে খানিকক্ষণ হিসাব কষলাম।

আমার প্রাথমিক অনুমান এই সমস্ত লোকজন কোনো একটা কমন ইনফেকশাস এজেন্ট–ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সেটার জন্য তারা হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময় একই জায়গায় থেকেছে। সেসময় এবং স্থানটা বের করতে পারলে কী ধরনের জীবাণু দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়েছে সেটা বোঝা যেত।

এখানে সমস্যাগুলোর একটি হলো, যে জীবাণু দিয়েই তারা আক্রান্ত হোক না কেন এটা রোগ প্রকাশ করতে দীর্ঘ সময় নিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ ল্যাবটেস্টে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ছে না।

মেরিনার বাবার কুলখানি অনুষ্ঠানের জন্য ওদের গ্রামে গেলাম সপ্তাহখানেক পর। মেরিনা খুব সম্ভবত চায়নি আমি এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে যাই। কিন্তু আমি নিজেই কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করি যেতে।

ও আমাকে বলল, তুমি ব্যস্ত মানুষ। এটা এমন কোনো জরুরি প্রোগ্রাম না।

প্রোগ্রাম কোনো ব্যাপার না। আমি আসলে তোমার বাবার অসুখটা নিয়ে চিন্তিত। আরেকটু ধারণা পেতে তোমাদের বাড়িতে যাওয়া প্রয়োজন।

ও আর আপত্তি করলো না। তবে মেরিনার মা খুব খুশি হলেন জেনে।

মেরিনার গ্রামের বাড়ি দিনাজপুরে। ঢাকা থেকে সৈয়দপুর ফ্লাইটে গিয়ে আড়াই ঘণ্টার গাড়ি যাত্রা। সকাল সকাল রওনা হয়ে দুপুরের দিকে পৌঁছে গেলাম। সৈয়দপুরে এখনো আমার অনেক পরিচিত মানুষ রয়েছে, এখানে রেল হাসপাতালে কাজ করার সুবাদে। তাদের সাথে দেখা করার সময় ছিল না। তবে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে আমার এক পুরাতন সহকর্মীর সাথে দেখা হয়ে গেল। ডাক্তার ইশতিয়াক, একসময় সৈয়দপুর হাসপাতালে আরএমও ছিল। এখন দিনাজপুরের ডেপুটি সিভিল সার্জন। আমি দিনাজপুরেই যাচ্ছি শুনে খুব উচ্ছ্বসিত হলো, একদিন যেন দিনাজপুর শহরে এসে চা খেয়ে যাই–তার জন্য খুব করে ধরলো।

আমার কথা দিতে হলো, কুলখানি অনুষ্ঠান শেষ করে ওর ওখানে যাব। মেরিনার বাড়ি থেকে প্রায় এক ঘণ্টার পথ।

৪.

অজপাড়াগাঁয়ে মেরিনাদের বাড়িটা আমার বেশ পছন্দ হলো। একটা ছিমছাম দোতলা বাড়ি, সামনে বিশাল উঠান। বাড়ির বাইরে মাটির রান্নাঘর।

এখানে ওরা বেশ প্রভাবশালী বুঝতে পারলাম।

মেরিনার এক চাচা, ইয়াকুব জামান, দিনাজপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সামনের মেয়াদে এমপি হওয়ার চেষ্টা করছেন।

তার দুই ভাইয়ের একই ভাবে মৃত্যু হওয়ায় ভদ্রলোক বেশ শঙ্কিত। আমি ডাক্তার জেনে এ ব্যাপারে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন।

ডাক্তার সাব, কী মনে হয়, আমার মৃত্যুও কি একই ভাবে হবে?

আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে বললাম, এর উত্তর আমার এখনো জানা নাই। কারণ রোগটা কী, সেটা এখনো পরিস্কার না।

শোনেন, ব্যাপারটা নিয়ে আমি ইতোমধ্যে দিনাজপুর মেডিকেলের একজন প্রফেসরের সাথে আলাপ করছি। উনিও আমাকে বললেন, এ ধরনের কোনো রোগের কথা তার জানা নাই। তার ধারণা নিপা ভাইরাসের মতো কোনো ভাইরাস এই এলাকায় আছে। উনি আমাকে কাঁচা কোনো রস, খেজুর বা তালের ইত্যাদি খেতে মানা করছেন।

হ্যাঁ, ভালো পরামর্শ দিয়েছেন। দিনাজপুর এলাকায় তো নিপাহ ভাইরাসের অনেক কেস আছে। উনি স্বভাবতই এই চিন্তা করছেন।

নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত বছর আমার এক কর্মী মারা যায়। ওকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম, আমার ভাইদের যে লক্ষণ ছিল সেসব ওর মধ্যে দেখি নাই। ছেলেটার জ্বর হইছিলো, তারপর সেন্সলেস হয়ে যায়। তার দুইদিন বাদে মৃত্যু।

হ্যাঁ, এটাই হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস বলি আমরা। হঠাৎ মস্তিস্কের প্রদাহ হয়ে মৃত্যু।

কিন্তু আমার ভাইদের মৃত্যু তো এইভাবে হয় নাই। তারা প্রচুর হাত পা ছোটাছুটি করছে, আর... উনি একটু থেমে বললেন, ওই পাগলের মতো হাসি।

আমি বললাম, এনসেফালাইটিস অনেক ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে। অনেকের মাথা খারাপের মতো হয়। তবে এটা ঠিক যে আপনার ভাই, কিংবা মেরিনার খালার একই রকম লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াটা একটা রহস্য। মনে হচ্ছে অন্য কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া। নিপাহ ভাইরাস হলে ঢাকায় করা ল্যাব টেস্টেই ধরা পড়তো।

শুনে তিনি কিছুটা মুষড়ে পড়লেন। আমি তাকে জানালাম, এই রোগের রহস্য নির্ণয় করার জন্য আমিও চেষ্টা করছি। বলতে পারেন এই কারণেই এবার আমি এসেছি। আমি এই এলাকাটাও একটু ঘুরে দেখবো বোঝার জন্য।

তাতে তার মুখে একটা অস্পষ্ট সন্তুষ্টির ছায়া দেখা গেল, আমাকে বললেন, ইয়াছিনরে আপনার সাথে দিয়ে দিব, আপনি ওকে নিয়ে ঘুরে দেখেন।

ইয়াকুব সাহেব আমাকে সেদিন আর একটা নতুন তথ্য দিলেন, বললেন একই ভাবে আরো কয়েকজন লোক এই এলাকায় মৃত্যুবরণ করেছে। এই গ্রামেই কোনো একটা বড়ো সমস্যা আছে।

আমি বেশ চমকালাম এ তথ্যে। বিস্তারিত জানতে চাইলাম। উনি তক্ষুনি ইয়াসিনকে ডাকলেন।

একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসি ছেলে হাজির হলো। মেরিনাদের বাড়িতেই গৃহস্থালি কাজ করে।

আমাকে এসে সালাম দিল।

ইয়াকুব সাহেব বললেন, ডাক্তার সাহেবকে হাসিব মাস্টারের বাড়ি নিয়া যা। উনি যা যা জানতে চান, তা যেন ঠিকঠাক ভাবে তারা বলে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, হাসিব মাস্টার আমার ছেলেরে এক সময় পড়াইতো। সেও গত বছর একই ভাবে মারা গেছে।

আমি ইয়াসিনকে নিয়ে সাথে সাথে রওনা হলাম।

ইয়াছিন যেতে যেতে বলল, হাসিব স্যার আমাগোর গ্রামের স্কুলের মাস্টার ছিল। এমন ভালো মানুষ। হঠাৎ কইরা মইরা গেল।

কয়েকবাড়ি পরেই একটা ছিমছাম গ্রামীণ বাড়িতে আমরা থামলাম। বাড়ির একপাশে গরু রাখার একটা শেড। সেখানে কয়েকটা গরু জাবর কাটছে।

আমরা গিয়ে দাওয়ায় বসলাম। ইয়াসিন বাড়ির ভিতরে গিয়ে কারো সাথে কথা বললেন, তারপর এক ভদ্রমহিলা বেড়িয়ে আসলেন। পয়ত্রিশ কি চল্লিশ বছর বয়স হবে।

ইয়াছিন বলল, ডাক্তার সাব, খালাম্মা হাসিব স্যারের পরিবার।

আমি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হাসিব স্যার কীভাবে মারা গেছে সেটা কি আমাকে বলতে পারেন।

ভদ্রমহিলা শক্ত গলায় বললেন, ইয়াছিন তুই সামনে থিকা যা। আমি ডাক্তার সাহেবের সাথে একলা কথা কমু।

ইয়াছিন বাক্যব্যয় না করে ঘাড় নেড়ে 'আচ্ছা' বলে বাইরে চলে গেল।

ভদ্রমহিলা তারপর আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, আপনি কী জন্য এতদিন পর জানতে চান আমার স্বামীর কথা।

আমি সংক্ষেপে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, দেখেন আমার মনে হচ্ছে আপনার হাজবেন্ড নতুন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তাই খোঁজ নিতে এসেছি।

মরার পর হাসপাতালের লোকজন তার শরীর কাঁটাকুটি করছিলো, তারা তো কিছু পাইলো না, আপনি আমার কথা শুইনা কী পাইবেন?

তারমানে পোস্টমর্টেম হয়েছিল; এই তথ্য আমার জন্য নতুন।

আমি বললাম, দেখুন, অনেক সময় কথা শুনেই অনেক রোগ নির্ণয় হয়, যা পরীক্ষানিরীক্ষা দিয়েও হয় না।

শোনেন, আমার স্বামীরে ইয়াকুব সাবরা মাইরা ফেলছে।

তারমানে?

তারমানে হইলো, এই রোগ তো আমাদের না, এই রোগ ইয়াকুব সাহেবদের পরিবারের রোগ। আমার স্বামী ইয়াকুব সাবের ছেলেরে টিউশানি পড়াইতো। এই করতে গিয়া তারও এই রোগ হইছে। ওগো অভিশাপ আমার স্বামীর গায়ে লাগছে।

আমি বললাম, আমি শুনেছি এই রোগ এ গ্রামের আরো কিছু মানুষের হয়েছে।

হ্যাঁ হইছে, ওই পরিবারে যাদের যাতায়াত ছিল এমন মানুষদেরই হইছে।

আমি এই অভিযোগের জবাবে কী বলবো তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একটু বিরতি নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কত বছর আগে উনি টিউশনি পড়াতেন।

ভদ্রমহিলা একটু হিসাব করে বললেন, আমার সাথে বিয়া হওয়ার বছরখানেক পর থেকে। তারমানে ধরেন বারো বছর আগে।

আমি আর কিছু জানতে চাইলাম না। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

৫.

ডক্টর ইশতিয়াক বলল, হ্যাঁ গতবছর আমরা এমন একটা দুইটা রোগীর পোস্টমর্টেম করেছি। মূলত, ওই এলাকা থেকে বেশ কিছু এনসেফালাইটিস রোগী রিপোর্ট হচ্ছিলো সে কারণেই। তবে শেষমেশ আমরা তেমন কিছু পাইনি।

কিন্তু রিপোর্ট এ বিশেষ কিছু ছিল কিনা সেটা তো না দেখে বলা মুশকিল।

আমি বললাম, আজকের মধ্যে কি কোনোভাবে ম্যানেজ করা যাবে রিপোর্টটা।

ইশতিয়াক একটু চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, ফরেনসিকে আমার এক পরিচিত আছে। তাকে ফোন দিয়ে দেখি।

মেয়র সাহেবের বাড়িতে এসেছি জেনে ইশতিয়াক কিছুটা চমকালো। আমাকে বলল, লোকটা কিন্তু সুবিধার না। তার নামে প্রচুর বদনাম।

আমি সেটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামালাম না। যে এমপি নির্বাচনে দাঁড়াবে তার নামে তো বদনাম থাকবেই।

মেরিনার বাবার কুলখানির অনুষ্ঠান গতকালই হয়ে গেছে। জম্পেশ খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ছিল। কুলখানি বা শ্রাদ্ধের মতো ব্যাপারগুলো আমার কাছে বেশ দৃষ্টিকটু, অর্থাৎ যেভাবে পালিত হয় সে ব্যাপারটা। মৃত্যু উপলক্ষ্যে যেন রীতিমতো আনন্দযাপন চলে।

এই ইতস্তত ভাব নিয়ে খেতে বসা সত্ত্বেও আমার খাওয়া বেশি হয়ে গেছে। কারণ সেটার আয়োজন। এই এলাকার বিখ্যাত আলু দিয়ে গরুর মাংস, সাথে কয়েক পদের ভর্তা-চাটনি। বার্বুচি আনা হয়েছে বগুড়া থেকে, কুলখানির রান্নার জন্য তার নাকি সুনাম আছে। প্রায় এক দেড়শো মানুষ খাওয়াদাওয়া করলো। মোটামুটি এলাহি কাণ্ড।

আজ সকাল সকাল ডাক্তার ইশতিয়াকের অফিসে হাজির হয়েছি। গতকালেই যখন জানতে পারি হাসিব স্যারের পোস্টমর্টেম হয়েছিল তখনই সিদ্ধান্ত নিই ইশতিয়াকের সাহায্য নেব। এখন দেখার বিষয় সাহায্যটা কতটুকু পাওয়া যায়। তবে ইশতিয়াক যেহেতু ডেপুটি সিএস, ও চাইলে সম্ভব।

আমি ওকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলেছি। এগুলো যে নতুন কোনো অসচরাচর রোগ হতে পারে সেটা ও কবুল করেছে, এবং সেটা যদি আসলেই হয় তাতে ও নিজেও কিছুটা কৃতিত্ব পাবে সেটা বলা বাহুল্য।

তাই আশা করছি ও ওর সর্বোচ্চ সাহায্যই করবে।

সিভিল সার্জনের দপ্তরে চা-নাস্তা খেয়ে আমরা দিনাজপুর মেডিকেলের দিকে রওনা হলাম। ফরেনসিক মেডিসিনের একজন ডাক্তার ওখানে আছেন, ইশতিয়াকের ঘনিষ্ঠ। ফোনে তিনি জানালেন, রিপোর্টটা তিনি পেয়েছেন, আমরা যেন এসে দেখে যাই।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বেশ ব্যস্ত হাসপাতাল। এই এলাকায় এত বড়ো হাসপাতাল এই একটাই। খুঁজলে নিশ্চয়ই আমারও পরিচিত অনেককে পেয়ে যাব। তবে সে ঝামেলায় গেলাম না।

ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ডাক্তার রাইসুলের সাথে পরিচিত হলাম। ভদ্রলোক এখানে বছর দুয়েক ধরে আছেন। ইশতিয়াক ফোন দেয়ার পর সে ফাইলপত্র ঘেঁটে রিপোর্টটা বের করেছে।

আমাদের কপিটা দেয়ার পর আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম।

যিনি রিপোর্ট করেছেন তিনি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি, তবে তার মনে হয়েছে মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্কের কিছু কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, পুরোপুরি স্বাভাবিক রূপে সেটি ছিল না। মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করার পর সেটার এক ছবি রিপোর্টে যুক্ত করা আছে। আমি ইশতিয়াকের অনুমতিক্রমে একটা ছবি তুলে

নিলাম আমার ফোন থেকে। রিপোর্টটা আমাকে একজন স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাতে হবে।

আজই ঢাকা ফিরতে হবে। তাই ইশতিয়াক থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে আমি মেরিনাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

পৌঁছে আমি মেরিনাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বললাম, শোনো, এখন পর্যন্ত যতজন আক্রান্ত হয়েছে তাদের একসাথে দেখা হওয়ার টাইমলাইন আমি বের করে ফেলেছি।

তোমার চাচা, খালা, বাবা এবং মইনুল সাহেবের অনেকবার দেখা হয়েছে নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানে। কিন্তু তোমাদের যে হাউজ টিউটর, হাসিব স্যার এর সাথে বাকি মইনুল ভাইয়ের দেখা হওয়ার সুযোগ খুব সীমিত।

হাসিব সাহেব এই এলাকায় ছিলেন না, তিনি বারো বছর আগে দিনাজপুরে আসেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় মইনুল ভাইয়ের ছবি দেখে নিশ্চিত হয়েছি ঠিক এগার বছর আগে তিনি শেষবার তোমাদের গ্রামে আসেন ইংল্যান্ড থেকে, ডিসেম্বর মাসে। তারমানে হাসিব সাহেব আসার পর মইনুল ভাই লাস্ট যেবার বাংলাদেশে ছিলেন সেবারই কিছু একটা হয়েছিল। কোনো এক অনুষ্ঠানে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত সবাই উপস্থিত ছিল।

মেরিনা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বলল, কেন ধরে নিচ্ছ একই জায়গা থেকে সবাই আক্রান্ত হয়েছে।

এটাই সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাটা ভুলও হতে পারে। তবে এটা এক্সপ্লোর করা উচিত আমাদের।

আচ্ছা আমি আম্মুর সাথে কথা বলছি। উনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।

এগার বছর আগে ডিসেম্বর মাস। মইনুল সাহেব ছিলেন। হাসিব স্যারও ছিলেন। ছিল মেরিনার ছোটো খালা ও বড়ো চাচা। এই সূত্র মেলাতে খুব বেগ পেতে হলো না।

জানা গেল সেই ডিসেম্বরেও একটা কুলখানির আয়োজন হয়েছিল এ বাড়িতে।

মেরিনার ছোটো ভাইয়ের।

সেবারও এমন আয়োজন হয়েছিল?

মেরিনার মা মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, অন্তত আশি নব্বই জন মানুষ তো ছিলই।

রান্না কি বাড়িতেই হয়েছিল না বাইরের বাবুর্চি আনা হয়েছিল?

মেরিনা আমাকে থামাল, তুমি কী শুরু করলে? বলতে চাইছো ওইদিনের রান্নায় সমস্যা ছিল?

আমি একটু থেমে বললাম, হ্যাঁ।

মানে?

মানে এটা জানা দরকার ওইদিন রান্নার কাজটা কে করেছিল?

কেন?

কারণ খুব সম্ভবত ওই রান্নায় অস্বাভাবিক কিছু মেশানো হয়েছিল। আমি রোগটা কী সেটা বের করে ফেলেছি। এর নাম কুরু। খুব অস্বাভাবিক কিছু খাওয়ার মাধ্যমেই কেবল এ রোগ হতে পারে। হাসিব স্যারের পোস্টমর্টেম এর ছবি পাঠিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়ায় এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসরকে, উনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তিনি কনফার্ম করেছেন ওনার রিপোর্ট কুরু রোগীদের সাথে মেলে।

আমি মেরিনার দিকে ফিরে কিছুটা দুর্বিনীত হয়ে বললাম, তাই আমাদের জানা দরকার সেদিন রান্না কে করেছিল এবং কীভাবে করেছিল।

মেরিনার মা বললেন, রান্না বাড়িতেই হয়েছিল। মেরিনার মা যেন আমার কথার অপেক্ষাতেই ছিলেন। আমি, আমার ননদ আর বার্বুচি ছিল একজন।

আমি একটু কড়া গলায় বললাম, একই দিনে এ গ্রামের একটি কিশোর ছেলে নিঁখোজ হয়। ছেলেটি সরকার বাড়ির। আমি খোঁজ নিয়েছি।

হ্যাঁ, লোকমান। সরকার সাবের ছেলে।

মেরিনা যেন থই পেল না।

মেরিনার চাচা ইয়াকুব সাহেব কোনো এক ফাঁকে আমার পিছনে এসে হাজির হয়েছেন দেখলাম। আমাদের কথোপকথোন তিনি শুনেছেন বোঝা গেল।

মেরিনাকে তিনি বললেন, মেরিনা, তোর ভাই পানিতে ডুবে মরে নাই। সরকার সাব তার লোক দিয়ে ওরে খুন করছিলো।

কী বলছো তোমরা? মেরিনা চিৎকার করে।

হ্যাঁ, আমি তখন মেয়র হিসেবে প্রথম ভোটে দাঁড়াই। তোর বাপও আমার সাথে নির্বাচনী কাজে ছিল। সরকার সাব তাতে খেপে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে এ কাজটা করে। তার এলাকায় তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াক এটা সে বরদাস্ত করতো না।

পুলিশে যাওনি তোমরা?

গেছি, পুলিশ কেস নেয় নাই। পানিতে ডুবে মৃত্যু রিপোর্ট করে। কোনো প্রমাণ ছিল না। এক-দুইজন দেখতে পেয়েছিল সরকার সাহেবের এক

লোকের সাথে শুভরে, তারপর ওর লাশ পানিতে পাই আমরা। যারা এ ঘটনা দেখছে তাদের কারো সাহস ছিল না তার বিরুদ্ধে মুখ খোলে। তাছাড়া সেসময় রানিং মেয়র ছিল সে।

তারপর? কুলখানিতে কী হয়?

ইয়াকুব সাহেব নির্লিপ্ত গলায় বললেন, সরকার সাহেব আমাদের ছোটো করে দেখছিলো, ভাবছিলো আমরা কিছু করতে পারবো না।

শুভর কুলখানির আগের দিন তার পোলা লোকমানরে আমার লোকেরা ধরে নিয়ে আসে।

তারপর? মেরিনার চোখ বিস্ফোরিত হয়।

আমরা কোনো প্রমাণ রাখতে চাই নাই। ওই ছেলের বডি আমরা খাসির মাংসে মিশায় দেই। পঞ্চাশ কেজি খাসির মাংসে আরো ত্রিশ কেজি অন্য মাংস, এইটা আলাদা করার সুযোগ নাই। সেটা দিয়ে শুভর কুলখানির রান্না হয়।

ওই খাবার খেয়ে আমাদের অন্তরের প্রতিশোধের আগুন নেভে।

মেরিনা ওর মা আর চাচার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, কীভাবে পারলে তোমরা এমন ভয়ংকর একটা কাজ করতে!

মেরিনার মা থমথমে গলায় বললেন, তখন আমাদের কারো স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ছিল না রে মা। তখন আমরা পাগল হয়ে গেছিলাম। পিশাচ হয়ে গেছিলাম।

প্রিওন ডিজিজ নামে এক ধরনের ব্যাধি রয়েছে, এ ধরনের রোগ কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস বাহিত রোগ নয়, শরীরের নিজস্ব প্রোটিনই পরিবর্তিত হয়ে এটা রোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়। সেই প্রোটিন পরবর্তীতে অন্যান্য প্রোটিনকেও নিজের মতো বানিয়ে ফেলতে সক্ষম। এটি নিরাময় যোগ্য নয়, ধরা পড়ার অল্প সময়ের মধ্যে রোগী মারা যায়। প্রিওন ডিজিজ খুব দুর্লভ, জেনেটিক কারণে হতে পারে, তবে এখনো চিকিৎসাবিজ্ঞান পুরোপুরি জ্ঞাত নয় কেন এ ধরনের সমস্যা মানুষের হয়। কুরু এক বিশেষ ধরনের প্রিওন ডিজিজ, যেটা অন্য প্রিওন ডিজিজে আক্রান্ত মাংস গ্রহনের মাধ্যমে হয়।

মেরিনার পরিবার যে ছেলেটিকে হত্যা করেছিল সে নিশ্চয়ই প্রিওন ডিজিজের রোগী ছিল। ছেলেটির দেহাংশ খাওয়ার কারণে এটি অন্যদের দেহে সংক্রমিত হয়, এই সংক্রমণকেই কুরু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

এ ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে যারাই মেরিনার ছোটো ভাইয়ের কুলখানিতে খেয়েছিল, তাদের বড়ো একটা অংশের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে

কুরু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে, যেটি মানুষ ভেদে দশ বছর থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর পরও হতে পারে।

কুরু পাপুয়ানিউগিনির একটি জনগোষ্ঠীতে প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। তাদের খাদ্য তালিকায় মানুষের মাংস একটি গ্রহণযোগ্য এবং উপাদেয় উপাদান।

যেমনটা বলছিলাম, এই অযাচিত রোগ নির্ণয় কারো জন্য ভালো কিছু বয়ে আনেনি।

সেবার মেরিনার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর ও আর আমার সাথে কোনো দিন দেখা করেনি।

পাথর



১.

সরকারি হাসপাতালে যতদিন কাজ করেছি সবসময় আমার যে ব্যাপারটায় মন খারাপ হতো সেটা হলো, এখানে আসা রোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা। প্রথম দিকে খুব বিরক্ত হতাম। একটা ঔষধ লাগবে বললে কিনতে পারে না, স্টিচ দেওয়ার সুতো জোগাড় করতে পারবে না–কিনে আনলেও কমদামি বিকল্প নিয়ে আসবে, সরকারি সামান্য ফিও দিতে অস্বীকৃতি জানাবে। সরকারি হাসপাতালে সবই ফ্রি মিলবে এমন ধারণা নিয়ে বেশ বড়ো সংখ্যক রোগী এখানে আসেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখানে সার্ভিস ফ্রি বা অতি স্বল্পমূল্যের, কিন্তু ঔষধপত্র নিজের জোগাড় করতে হয়। কিছু সাধারণ ঔষধ পথ্য হয়তো সাপ্লাই দেয়া হয়, কিন্তু সেগুলোও একইভাবে সবসময় থাকে না। আমরা ডিউটি ডাক্তাররা ধরে নিতাম, এখানে অনেক রোগী সামর্থ থাকলেও সরকারি সাপ্লাই পেয়ে যাবে সে আশায় ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনে আনেন না, এটা নিয়ে রোগীর লোকজনের সাথে তাই কথাবার্তা হত অসন্তুষ্টিজনক। চোখের সামনে রোগী খারাপ হতে দেখা এবং সস্তা ব্রান্ডের ঔষধ বা হেলথ লজিস্টিক ব্যবহার করায় রোগীর প্রোগনোসিস খারাপ হয়ে যাওয়া–এটা প্রত্যক্ষ করাটা কোনো ডাক্তারের জন্যই সহজ না।

কিন্তু একটা পর্যায়ে রোগীদের সাথে ঘনিষ্ঠ কথাবার্তায় ধীরে ধীরে জেনেছি, এমন অনেক রোগীই এখানে আসেন, যাদের হাতে একদমই কোনো পয়সা নেই। তারা হয়তো শেষ সম্বল বিক্রি করে গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন চিকিৎসা করাতে, সেটাও শেষ হয়ে গেছে দালালের হাতে পড়ে, বা অসৎ বেসরকারি হাসপাতালের খপ্পড়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে শেষমেশ রোগীকে বাঁচাতে তারা নিঃস্ব হাতেই সরকারি হাসপাতালে হাজির হন।

এই সত্যিকারের বিপদে পড়া রোগীদের আলাদা করে বের করাও মুশকিল। কেননা তারা মুখ ফুটে বেশিরভাগ সময় তাদের অসহায়ত্বের কথা বলতে পারেন না।

এমন একটি রোগীর কথা আজ বলি, আমি তখন কাজ করি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে।

রোগীর আসল নাম প্রকাশ করছি না, ধরে নেই ওর নাম রত্না। রত্নার বয়স কত হবে, বড়োজোর ত্রিশ। নুনিয়ারছড়ায় একটা জেলে বস্তি আছে, ওখানে থাকতো।

রত্না সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হয় কোলেলিথিয়াসিস নিয়ে। অর্থাৎ ওর পিত্তথলিতে পাথর ছিল। সেটার কারণে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে আসে।

রিসিভ করার সময় আমি ছিলাম না, ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতে গিয়ে আমি রত্নাকে পাই। একটা পেইনকিলার দিয়ে মেঝের একটা বেডে রাখা, ব্যথায় কুঁকড়ে ছিল। এক ইন্টার্ন ডাক্তার আমাকে বিস্তারিত বলল–গতকাল সন্ধ্যায় রোগী এসেছে। তারপর আল্ট্রাসাউন্ড করানো হয়েছে, ব্লাড আর ইউরিন টেস্টসহ প্রয়োজনীয় সব টেস্ট করানো হয়েছে। কক্সবাজার সদরে প্রচুর শরণার্থী রোগী আসে বলে বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলোর বদৌলতে প্রায় সব ধরনের টেস্টই হয়। টেস্ট রিপোর্ট এবং আল্ট্রাসাউন্ড বলে দিচ্ছে রোগীর খুব দ্রুত অপারেশন লাগবে। পিত্তথলিতে বেশ কয়েকটা পাথর আছে।

রত্নার সাথে এসেছে ওর স্বামী সোলায়মান আর শ্বাশুড়ি। হিস্ট্রি নিয়ে জানলাম রত্নার দুটো বাচ্চা আছে, একজনের বয়স সাত বছর অন্যটি তিন।

রত্না এর আগে কখনো হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। এমনকি সন্তান জন্মদানের সময়ও না।

অপারেশনের কথা শুনে সোলায়মান খুব ঘাবড়ে গেল। প্রথমেই আমাকে জানালো তাদের হাতে তেমন কোনো টাকা পয়সা নেই।

সোলায়মানের সাথে কথা বলে জানলাম, সে মাছের মৌসুমে মাছ ধরে আর বাকি সময় কক্সবাজার শহরে শ্রমিক হিসেবে যে কাজ পায় তাই করে। দৈনিক আয়ই তার বেঁচে থাকার মাধ্যম। রত্না কোনো এক বাড়িতে রান্নার কাজ করে। সেটাও গত একমাস ধরে বন্ধ।

আমি বুঝে গেলাম অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ওরা কিনতে পারবে না। ওয়ার্ডের ফান্ডে খোঁজ নিলাম, সেখানে কিছু ঔষধপত্র আছে। অন্য ওয়ার্ডের কলিগদের অনুরোধ করে আরো কিছু জিনিসপত্র জোগাড় করলাম।

রত্নার অপারেশন হয়ে গেল রাতেই। সহজ এবং ছোটো ল্যাপারোস্কপিক অপারেশন হওয়ার কথা থাকলেও শেষমেশ ওপেন কোলেসিসটেকটমি করা হলো। পিত্তথলি থেকে সব মিলিয়ে বারো-তেরটা ছোটোবড়ো পাথর বের করা হলো। পাথরগুলো পিগমেন্টেড। দেখে মনে হলো বিলিরুবিন জমে তৈরি হয়েছে। তবে পাথরগুলোর রঙ একটু অন্যরকম। ওটি নার্সকে বললাম পাথরগুলো একটা জিপলক ব্যাগে করে আমাকে দিয়ে দিতে। মানুষের দেহজ পাথরের ব্যাপারে আমার আগ্রহ রয়েছে, বেশ কয়েকধরনের পাথর

আমি জমিয়ে রেখেছি। ইন্টার্নিদের ওয়ার্ডে ডেমো দেয়ার সময় এগুলো কাজে লাগে।

রত্নাকে সবমিলিয়ে তিনদিন হাসপাতালে থাকার অর্ডার লিখে দিয়ে এলাম।

রত্না হাসপাতালে একদিন থাকলো। তারপর দিন থেকে লাপাত্তা। রাউন্ডে না পেয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। নার্স বললো রোগী পালিয়েছে। কাগজপত্রও কিছু নেয়নি।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আরো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। রত্নার যে অ্যান্টিবায়োটিক চলছিল সেটা যাতে ওয়ার্ডের নিজস্ব সাপ্লাই থেকে দেয়া হয় সেটা বলে এসেছিলাম। কিন্তু সাপ্লাইতে সেটা ছিল না—অন্য কোনো রোগীকে দেওয়ায় সেটা শেষ হয়ে গিয়েছিল যা আমার জানা ছিল না। ডিউটি নার্স স্বভাবতই রোগীর পার্টিকে দিয়ে প্রথমদিনেরটা কিনিয়ে আনিয়েছে। দ্বিতীয় দিনে আবার কিনতে হবে সে ভয়েই হয়তো কাউকে কিছু না জানিয়ে রোগী নিয়ে চলে গেছে ওর স্বামী।

এমন ঘটনা এবারই প্রথম তা না। তাই মন কিছুক্ষণ বিক্ষিপ্ত থাকলেও পরে ভুলে গেলাম।

সেদিন বিকালে বাসায় এসে আবার রত্নার কথা মনে পড়ে গেলো, কারণ ওর পিত্তথলির পাথরগুলো টেবিলে পড়ে থাকতে দেখলাম। অপারেশনের দিন নিয়ে এসে টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম, আমার কালেকশনে সাজিয়ে রাখা হয়নি।

পাথরগুলো ভালো মতো ওয়াশ করে রাখতে যাব, একটা ব্যাপার দেখে একটু চমকালাম। আমার দেখা কোনো গলব্লাডার স্টোনের সাথে এদের মিল খুঁজে পেলাম না। সাধারণত আমি ক্লোস্টেরল স্টোনগুলো একটা জারে রাখি, পিগমেন্টেড গুলো অন্য জারে। কিছু স্টোন হয় যেগুলো এদুটোর মাঝামাঝি, তাদের মেডিকেল টার্মই হলো মিক্সড স্টোন। কিন্তু রত্নার স্টোনগুলো একদমই আলাদা। ওয়াশ করতেই একটা লেয়ার উঠে গিয়ে ভিতর থেকে চকচকে সবুজাভ জ্বলজ্বলে স্টোন বেড়িয়ে এল।

একটা অদ্ভুত সম্ভাবনা মাথায় আসলো। পাথরগুলো থেকে একটা নিয়ে একটু পালিশ করে চলে গেলাম রত্ন পাথরের দোকানে। কক্সবাজারে এমন দোকান একটিই আছে বাহারছড়ায়। সেখানে এক বয়স্ক জহুরি পাথরটা খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার বিশেষ চশমা দিয়ে দেখে আমাকে বলল, সাইজে ছোটো বেশি দাম পাবেন না।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করে বললাম, কেমন দিতে পারবেন?

উনি আমার দিকে তীর্যকদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কত চান বলেন?

আমি এবার পাথরটা তার হাত থেকে নিয়ে বললাম, দেখেন আমি ভালো দাম না পেলে ঢাকায় নিয়ে যাব। আপনি কততে পারবেন বলে দেন।

শুনে উনি একটু মনে মনে হিসাব করলেন, তারপর বললেন, এক দশ দিতে পারবো?

এক দশ? নাহ! পাগল নাকি। আমি চলে যাওয়ার ভান করলাম।

তিনি পিছন থেকে থামালেন। শোনেন, আমি ম্যাক্সিমাম আর দশ হাজার বাড়াবো।

আমি যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। কোনো এক অসচরাচর কারণে রত্নার গলব্লাডার অতিমূল্যবান রত্ন পান্না তৈরি করা শুরু করেছিল!

২.

রোগীর গলব্লাডার বা পিত্তথলিতে কী ধরনের পাথর তৈরি হবে তা কিছু ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। প্রথমত রোগীর পিত্তরসের প্রকৃতি কেমন, সেটাতে যদি ক্লোরেস্টল অনেক বেশি পরিমানে থাকে তাহলে সেটা পাথর তৈরির জন্য সহায়ক। তারপর রয়েছে রোগীর অ্যানাটমিকাল বা গঠনগত কারণ, তার পিত্তরস নিষ্কাষণে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে সেটাও এক সময় পাথর তৈরিতে ভূমিকা রাখে। এবং রোগীর জীবনযাপন কেমন অর্থাৎ রোগী কী ধরনের খাবার খাচ্ছে, সে মোটা না চিকন, সে খুব দ্রুত ওজন কমিয়ে ফেলছে কিনা ইত্যাদি নানা কারণ।

রত্নার ক্ষেত্রে পান্না তৈরি হলো কীভাবে সে প্রশ্নের উত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখনো নেই এবং তারমানে এটা এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা। হাসপাতালে রেজিস্ট্রিবই থেকে রত্নার ঠিকানা জোগাড় করে আমি নুনিয়ারছড়া চষে ফেললাম।

সমুদ্রতীরে এক অতি জীর্ন, পলিথিন আর বাঁশদিয়ে তৈরি এক ঘরে শেষমেশ রত্নাকে আবিষ্কার করলাম।

আমাকে দেখে ওরা ভূত দেখার মতো চমকালো।

রত্নার স্বামীকে যথেষ্ট লজ্জিত মনে হলো পালিয়ে আসার জন্য। আমি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম কোনো অভিযোগ নিয়ে আমি আসিনি। রত্নার বাচ্চাদুটি ঘরেই ছিল। অপুষ্টিভোগা শীর্ণ দুটি শিশু। দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা শিশুদের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি করে, শুধু যে তাদের শারীরিক বিকাশে হাত

দেয় না তাই না, সমাজ তাদের ভীত সন্ত্রস্ত আত্মবিশ্বাসহীন হিসেবে বড়ো করে তোলে।

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, কিডস, ডোন্ট ওরি। ইউর মাম ইজ রিচ!

আমি গতকাল ঢাকার এক রত্ন ব্যবসায়ির সাথে হিসাব করে দেখেছি, রত্নার পাথরগুলো মূল্য অন্তত অর্ধকোটি টাকা।

রত্নার অবস্থা ভালো মনে হলো না। গায়ে হাত দিয়ে বুঝলাম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তারমানে শরীরে ইনফেকশন আছে। সোলেমানের হাতে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা ধরিয়ে দিলাম–সবচেয়ে ছোটো পাথরটা বিক্রি করে যা মিলেছে তার তিনভাগের একভাগ, আপাতত এটুকু যথেষ্ট হবে। বাকি পাথরগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করিনি। রত্না সুস্থ হলে ওদের পাথরগুলো ফিরিয়ে দেব সে রকম পরিকল্পনা করেছি।

রত্নার স্বামীকে একটা প্রাইভেট হাসপাতালের ঠিকানা লিখে দিলাম। বললাম এক্ষুনি রত্নাকে নিয়ে ওখানে ভর্তি করিয়ে দিতে। আসার আগে আবারও বললাম, রত্নার চিকিৎসার জন্য যত খরচ লাগে তা এতেই হয়ে যাবে। তারপরও লাগলে আমি ব্যবস্থা করবো।

সোলেমান আমার এই বদান্যতা কীভাবে গ্রহণ করছে সেটা বুঝতে পারলাম না। তবে অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই।

এখনই মূল ঘটনাটা আমি ওদের বলতে চাচ্ছিলাম না। রত্না সুস্থ হয়ে ফিরে আসলে বিস্তারিত জানানো যাবে।

বিকালে আমার ডিউটি শেষে প্রাইভেট হাসপাতালে আমার পরিচিত একজনকে ফোন দিয়ে জানার চেষ্টা করলাম ওরা এসেছে কিনা। ও জানালো হ্যাঁ রোগীটা এসেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম রাতে দেখে আসবো।

রাত ন'টার দিকে আমি যখন হাসপাতালে যাই, তখন জানলাম রত্না এক্সপায়ার করেছে। ডিউটি ডাক্তার আমাকে জানালো, হঠাৎ করে রোগী শকে চলে গিয়েছিল। ওদের ধারণা সেপটিক শক। ইনফেকশন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছিলো।

হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে আমি হতভম্ব হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম। ইচ্ছা করছিলো আমার মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলি। রোগীর সাথে আজকে আমি সারাদিন কেন থাকলাম না সে আফসোস আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো।

আমি আসার আগেই লাশ নিয়ে রত্নার স্বামী চলে গিয়েছিল।

৩.

তিনদিন পর আমি আবারও নুনিয়ারছরার সেই জেলে বস্তিতে যাই, কিন্তু রত্নার পরিবারের কাউকে পাইনা। ওরা রত্নার মৃতদেহ সৎকার করতে অন্যকোথাও চলে গেছে। আশপাশ থেকে জানার চেষ্টা করলাম কোথায় গেছে, কেউ নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারলো না।

কয়েকদিন পর আবারও আমি ওখানে যাই। রত্নার জীর্ণঘরে আমি আরেকটা পরিবারকে আবিষ্কার করি। এক নেতা গোছের ছেলে জানালো, সোলেমান আর ফিরবে না; যাওয়ার সময় সেটাই নাকি বলে গেছে।

ছেলের কাছ থেকে ওদের ঠিকানা, ফোন নাম্বার ইত্যাদি জানার চেষ্টা করলাম, ছেলেটা জানালো এমন কোনো তথ্য ওর কাছে নেই। এখানের বস্তিতে এটা সাধারণ ঘটনা, অল্প কিছুদিনের জন্য অনেকেই আসে।

তীব্র হতাশ হয়ে আমি আমার ফোন নাম্বারটা ছেলেটাকে দিয়ে আসি। যদি ওরা কোনো দিন ফেরে তাহলে যেন আমাকে দয়া করে জানায় সে অনুরোধ করে আসি।

আমরা যারা সাধারণ পরিবেশে রয়েছি, তারা ভাবি এ যুগে কারো বোধহয় হারিয়ে যাওয়া সম্ভব না। নানা ভাবে মানুষকে খুঁজে বের করার পদ্ধতি আমরা বের করেছি–জন্ম নিবন্ধন, সরকারি পরিচয়পত্র, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রফাইল–কতকিছু। কিন্তু ভাসমান মানুষদের খুঁজে পাওয়া কত কঠিন তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, তাদের খুঁজে বের করার কোনো কিছুই নেই।

এই ঘটনার প্রায় বছরখানেক পরেও রত্নার পরিবারের কাউকে আমি খুঁজে পেলাম না। ওরা যেন হারিয়ে গেছে চিরতরে।

রত্নার জীবনটা আমার ভীষণ জানার প্রয়োজন ছিল। নিশ্চয়ই ওর ডায়েটে বিশেষ কিছু ছিল। ও আশপাশের কোনো গাছের শিকড় বা বাকল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো কি? নাকি সমুদ্র থেকে পাওয়া কিছু? ওর কোনো জেনেটিক্যাল অনন্যতা ছিল? ইত্যাদি কত কিছু জানার প্রয়োজন ছিল। আর প্রয়োজন ছিল পরিবারটিকে রত্নগুলো ফিরিয়ে দেবার।

প্রায় রাতেই এখনো আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। দেখি রত্নার হাড়সর্বস্ব দুটি মেয়েকে। ওরা আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি ঘুমাতে পারি না।

আর আমার টেবিলের এক পাত্রে রাখা দশ বারোটি মহামূল্যবান পান্না রুমের স্বল্প আলোতে চকচক করতে থাকে।

রত্নার দারিদ্র্যক্লিষ্ট শিশুদুটির চোখের মতোই।



মাশুদুল হকের জন্ম ঢাকায়, সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক, এক দশকের বেশি সময় ধরে লিখছেন গল্প ও উপন্যাস।
বিষয়বস্তু: রহস্য উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ও শিশুকিশোর সাহিত্য।

সাহিত্য পুরস্কার: কালি ও কলম তরুণ কথাসাহিত্যিক পুরস্কার ২০১৩

ওয়েবসাইট: www.masudulhaque.com

লেখকের ছবি: তারেক আহমেদ

অসচরাচর নাজুক মানসিক অবস্থার একজন তরুণ ডাক্তারের গল্প, রোগী দেখতে গিয়ে যিনি কিছু বিচিত্র বিপজ্জনক আর অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান, যেসবের হয়তো কোন ব্যাখ্যা নেই বা সেসব ব্যাখ্যার জন্য আমরা প্রস্তুত নই।

মহাকাল